চণ্ডীচিন্তা

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

চণ্ডী-চিন্তা

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

গোরক্ষপুর মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রী কলেজের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ
শ্রীযুত অক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত ভূমিকা

দাস—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

প্রকাশক—
শ্রীসুদর্শন সম্পাদক
৩, অন্নদা নিয়োগী লেন
বাগবাজার ; কলিকাতা-৩

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী
১৩৭০ সাল, হরিপুরুষাব্দ ৯৬
প্রথম সংস্করণ—১২০০

মূল্য—৩্ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীবামা চরণ মণ্ডল
রাণীশ্রী প্রেস
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

চণ্ডী-চিন্তায় মায়ের স্বরূপ ভাবনার আবর্ত্তে
ধ্যান জাগিল, মাতৃত্বের জীবন্ত দর্শন পেয়েছি কোথা মর্ত্ত্যে !
অন্তরাকাশে ফুটিল, দুইখানি দেবী-মার মূর্ত্তি,
দুই চিন্ময়ী প্রতিমা, প্রেম আর ভক্তি।
বন্ধুসুন্দরের অগ্রজা, দুইটি স্নেহরসের খনি,
দেবী দিগম্বরী, দেবী গোলোকমণি।
পুরে যোগমায়া, পুরীতে সুভদ্রা, পুরুষোত্তমের লীলায় ;
দিগম্বরী আঙিনায়, গোলোকমণি পাবনায়,
শ্রীহরিপুরুষের খেলায়।
একজন দেখিলেন তুলসী পরিক্রমায়
বৃন্দারাণীর বিম্ব জগতসুন্দরের চরণে রাজে,
অপর দেখিলেন বস্ত্রাবরণ মুক্ত হওয়ায়,
ভৃগুপদলাঞ্ছন জগদ্বন্ধুর শ্রীবক্ষ মাঝে,
তবুও, ভ্রাতৃবাৎসল্যে "মঙ্গলচণ্ডী" পূজিতেন তাঁর মাঙ্গল্যে ;
রামানুজের যেরূপ বলরাম সাজ,
আজ অনুজাদের সেরূপ অগ্রজার কাঁচ,
স্নেহধারা রাখিলেন যাহা ধরিয়া,
প্রাণ ভরিয়া, দিলেন উজাড় করিয়া,

বর্ষায় যেমন গিরিগাত্রে বারি বয়,
উদ্বেলিত বাৎসল্য ধারা দু'জনার অন্তর-বাহিরময় ।
সন্নিধানে যে আসিত ভাসিত মধুপ্লাবনে।
জীবাধম আমিও কত ভাসিয়াছি, তাই তো দিতে আসিয়াছি
এই ক্ষুদ্র ডালি তাঁ'দের উদার করে,
নতজানু যুক্তকরে নিবেদন করুণ স্বরে
গ্রহণ করুন, আশিস ক'রে
সিক্ত করুন ভক্তিবরে।

স্নেহাভিভূত মহানামব্রত

ভূমিকা

বৈজ্ঞানিকের ঈশ্বরাবিষ্কার

একজন বিশ্ববিখ্যাত আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিককে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিলেন,—মহাশয়, আপনি ত সারাজীবন অক্লান্ত তপস্যা ক'রে প্রকৃতি রাজ্যের বহুবিধ সূক্ষ্ম রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছেন এবং আপনার অসাধারণ প্রতিভা-বলে মানব সমাজের সুখ সুবিধার জন্য নানাপ্রকার উপকরণও সৃজন করেছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার নিজের বিচারে আপনার শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার কি? বৈজ্ঞানিকপ্রবর একটু হেসে এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দিলেন,—God (ঈশ্বর)। বন্ধু এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে বিস্মিত হয়ে ইহার একটু বিশদ ব্যাখ্যা চাইলেন। প্রবীণ বৈজ্ঞানিক সংক্ষেপে তাঁর ঈশ্বরাবিষ্কারের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তার সারমর্ম আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করি।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রথম থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ সমূহের বাস্তব সত্তা মেনে নিয়ে তত্ত্বানুসন্ধান শুরু করে। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি। নিরীক্ষণ পরীক্ষণ বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ যুক্তি বিচার ইত্যাদি বিবিধ উপচয়ে আমাদের তত্ত্বানু-সন্ধান যত অগ্রসর হয়, ততই এই ইন্দ্রিয়গোচর জগতেই চিত্ত-চমৎকারী নূতন নূতন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তা আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও আমরা প্রয়োগ করিতে সামর্থ্য

অর্জ্জন করি। এই সব রহস্যের ইয়ত্তা নাই। যতই আবিষ্কারের পর আবিষ্কার হ'তে থাকে, এই জগৎ যে কত রহস্যময় তা ততই আমরা উপলব্ধি করতে থাকি। আমাদের বিজ্ঞানের যত প্রসার হয়, আমাদের জ্ঞানের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আমরা ততই সজ্ঞান হ'তে থাকি। আমরা বুঝতে থাকি, জ্ঞাতব্যের তুলনায় আমাদের জ্ঞাত কত সামান্য।

আমাদের বিজ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়গোচর অসংখ্য স্থূল পদার্থের রহস্য ভেদ করে সারা বাস্তব জগতের উপাদানরূপে কয়েকটি মাত্র মৌলিক বস্তু (elements) আবিষ্কার করতে সমর্থ হ'ন এবং তাদেরই সংযোগ বিয়োগে সারা বিশ্ব রচিত বলে সিদ্ধান্ত ক'রল, আবার প্রত্যেকটি মৌলিক বস্তুর সূক্ষ্মতম পরমাণুস্বরূপ নিরূপণ করে তাদের সংযোগ বিয়োগের কতকগুলি নিয়মপ্রণালীও নির্ধারণ ক'রল। তখন বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমাদের নিবিড় পরিচয় হ'ল বলে বৈজ্ঞানিকদের যে অভিমান হয়েছিল, তা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে সব জড়পরমাণু অবিভাজ্য অপরিণামী নিত্যসত্য ব'লে স্বীকৃত হয়েছিল, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তারাও বিভাজ্য পরিণামী ও অনিত্য ব'লে প্রতিপন্ন হ'ল, তাদেরও গঠন ও প্রকৃতির মধ্যে কত জটিলতা ও রহস্যময়তা আবিষ্কৃত হল। প্রত্যেকটি পরমাণু কতকগুলি শক্তির অদ্ভুত সমাবেশ বলে প্রমাণিত হ'ল; সেই সব শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করার কৌশলও মানুষের কতকটা করায়ত্ত হল, সেই সব শক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কি প্রচণ্ড ক্রিয়াসামর্থ্য লাভ করে, তারও পরিচয় পাওয়া গেল। জড়ের ধারণাই বদলে গেল। প্রত্যেকটি

জড় পরমাণু শক্তিময়, শক্তিই জড়ের উপাদান, আধুনিক বিজ্ঞান ইহা প্রতিপাদন করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, শক্তি জড়ের ধর্ম নয়। জড় বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতেই যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তা নয়; যা জড় বলে প্রতীয়মান হয়, তা শক্তিরই অবস্থাবিশেষ, পরিণাম বিশেষ, সমন্বয় বিশেষ।

বহুবিধ বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ পরীক্ষণ এবং সূক্ষ্ম গণিত ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসন্দেহেই প্রতিপাদন করেছে যে, বিশ্বজগতের সকল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত শক্তিরই বিচিত্র খেলা চলছে। সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রেও যেমন, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তেমনি; গতিশীল ও ক্রিয়াশীল পদার্থগুলির মধ্যেও যেমন, আপাততঃ স্থিতিশীল ও নিষ্ক্রিয় পদার্থগুলির মধ্যেও তেমনি; বহির্জগতেও যেমন, আমাদের অন্তর্জগতেও তেমনি, সর্বত্র সর্বদা শক্তিরই বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র অভিব্যক্তি, বিচিত্র রূপরূপান্তর গ্রহণ। শক্তি ছাড়া কোন বস্তুর কোন যথার্থ পরিচয় আমরা পাই না। সুতরাং বস্তুর শক্তি, একথা বলা নিরর্থক। ক্রিয়ার মধ্যে যেমন শক্তির পরিচয়, বস্তুর মধ্যেও তেমনি শক্তিরই পরিচয়। প্রত্যেকটি বস্তু একটি শক্তিকেন্দ্র ছাড়া বা শক্তির সমন্বিত অবস্থাবিশেষ ছাড়া কিছুই নয়।

শক্তিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া দেখে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করি, যথা—বিদ্যুৎশক্তি, আলোকশক্তি, উত্তাপশক্তি, চুম্বকশক্তি, রাসায়নিকশক্তি, পরিমাথিকশক্তি, ইত্যাদি। তদতিরিক্ত, জীবজগতে আমরা প্রাণশক্তির বিচিত্র

খেলা দেখি। মনোরাজ্যে মনঃশক্তির বিচিত্র বিলাস দেখি, বুদ্ধিরাজ্যে বুদ্ধিশক্তির বিচিত্র পরিচয় পাই। এই সব শক্তি যে শুধু পরস্পরের সহিত বিচিত্র সম্বন্ধে মিলিত হয় ও সংঘর্ষ করে, সহযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে, তাই নয়, এক শক্তি অন্য শক্তিরূপে পরিণত হয়, রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতিরাজ্যে এক শক্তির অন্য শক্তিতে পরিণত সর্বদাই চলছে ; আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়েও এক শক্তিকে অন্যশক্তিতে রূপান্তরিত করে থাকি। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয় ক্রিয়ার অভিব্যক্তির মধ্যে শক্তি বহুবিধ বলে প্রতীয়মান হলেও, সব শক্তিই যে মূলতঃ এক, এতে কি সন্দেহ করা চলে ; একই মূল শক্তি বিচিত্র ক্রিয়ার ভিতরে বিচিত্র আকার ও উপাধিগ্রহণ করে, বিচিত্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, ইহাই কি প্রতিপন্ন হচ্ছে না ?

প্রকৃতিরাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে শক্তির যে সব বিচিত্র পরিণাম, বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, বিচিত্র রূপ-রূপান্তর গ্রহণ, বিচিত্র গতিবিধি ও কার্যোৎপাদন আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, তার মধ্যে প্রায়শঃ আমরা নিয়ম শৃঙ্খলার পরিচয় পাই। সব ক্ষেত্রেই শক্তির যেন সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আছে। বিজ্ঞান এরূপ অনেক নিয়ম আবিষ্কার করেছে ও করছে। এগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম বলি এবং প্রায়শঃ অখণ্ডনীয় ব'লে গণ্য করি। কিন্তু সূক্ষ্মতর অনুসন্ধানে দেখতে পাই যে, সব ক্ষেত্রেই যে শক্তি এই সব নিয়মের বন্ধন মেনে চলে, তা নয়। আমাদের আবিষ্কৃত নিয়মশৃঙ্খলাকে উল্লঙ্ঘন করেও শক্তি অনেক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে এবং আপনার স্বাতন্ত্র্যের

পরিচয় দেয়। শক্তিকে আমরা সর্বতোভাবে নিয়মাধীন বলতে পারি না। শক্তির কার্য দেখেই আমরা নিয়ম আবিষ্কার করি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রেও শক্তি কার্য করে। শক্তির ক্রিয়ার মধ্যে স্থূল জগতে আমরা এক জাতীয় নিয়ম দেখি, সূক্ষ্ম জগতে অন্যপ্রকার ; জড় জগতে একপ্রকার, জীবজগতে কখন কখন তার বিপরীত। সুতরাং শক্তি যে শুধু নিজের সত্তায় সত্তাবতী, তা নয় ; কার্য জগতে আপনাকে বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্ত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও আছে, এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'য়ে পড়ে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যে এত বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রকারের শক্তিপরিণাম দেখি, এত অভিনব সৃষ্টি ও আকস্মিক ধ্বংস দেখি, এত নিয়মের বাঁধন ও তার সাথে এত নিয়মের ব্যভিচার দেখি, এর মধ্যেও আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এ কথা অস্বীকার করতে পারে না যে, দেশে কালে অপরিচ্ছিন্ন, অসংখ্য সৌরমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডল-বিশিষ্ট, অশেষ জটিলতা সমাকীর্ণ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ একটা রহস্যময় ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। এর একটা আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র আছে, এর সর্বাবয়বে একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। একটা প্রাণশক্তি যেন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে বিধৃত ক'রে রয়েছে। এটা যেন কারো একটা বিরাট দেহ ; এ কথাটা শুধু কবিকল্পনা মনে হয় না।

এই বিরাট বিশ্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীর ক্রম-বিকাশের ইতিহাসও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, কি আকস্মিক ভাবে সূর্যের একটা টুকরা খ'সে এসে একটা নির্দ্দিষ্ট

কক্ষে সূর্যকেই প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল, কি অদ্ভুতভাবে একটা প্রচণ্ড তাপবিশিষ্ট অগ্নিগোলকের অবস্থা থেকে শক্তি-পরিণামের ভিতর দিয়ে সূর্যের এই টুকরাটী আকাশে বাতাসে জলে স্থলে পর্ব্বতে অরণ্যে অগ্নি বিদ্যুতাদিতে বিভক্ত হ'য়ে এ সকলের সুন্দর সমাবেশে কালক্রমে জীববসতির যোগ্যতা লাভ করল, কি রহস্যময় প্রণালীতে এই জড় পিণ্ডের মধ্যে প্রাণের অভ্যুদয় হ'ল, প্রাণের মধ্যে আবার মনের বিকাশ হ'ল, মনের মধ্যে বুদ্ধির উদয় হ'ল, এবং ক্রমে এই পৃথিবী মনুষ্য-সভ্যতার লীলাভূমি হ'ল। এই বিবর্তনের মধ্যে কতবার কতপ্রকার ভাঙ্গাগড়া হয়েছে, কত সৃষ্টি প্রলয় ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এসবই তো শক্তিরই খেলা। প্রাণ মন বুদ্ধি, সবই ত এক শক্তিরই বিচিত্র রূপ। সূর্যও শক্তিময়, নক্ষত্রাদিও শক্তিময়, পৃথিবীও শক্তিময়ী। কত সৃষ্টি ও ধ্বংসের সমাবেশে কী অদ্ভুত সংগঠন!

বিজ্ঞান আমাদের সামনে যে সব তথ্য উপস্থিত করেছে, তা থেকে আমরা অক্লেশেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অশেষ বৈচিত্র্যসমাকুল ও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হ'লেও এবং এর প্রত্যেক বিভাগে সর্বদা সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের তাণ্ডব লীলা চললেও, এর সমস্ত অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের মধ্যে একটা একত্ব আছে, একটা যোগযুক্ত সংঘবদ্ধ ভাব আছে, সুতরাং নিশ্চয়ই এর একটা প্রাণকেন্দ্র আছে। সেই প্রাণকেন্দ্র অবশ্যই অনন্ত শক্তির আধার, স্বসত্তায় সত্তাবান্, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংক্রিয় ও স্বতন্ত্র। সেই প্রাণকেন্দ্র থেকেই চিরকাল অসংখ্য প্রকার শক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে, অসংখ্য প্রকার

রূপরূপান্তরের সৃষ্টি হচ্ছে, সেই প্রাণকেন্দ্রই স্বীয় অসীম শক্তিতে বিশ্বের সকল অংশকে, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বিধৃত ক'রে সংঘবদ্ধ ক'রে যোগযুক্ত ক'রে ধ'রে রেখেছে, সেই প্রাণকেন্দ্রই বিশ্বের সকল ব্যষ্টি ও সমষ্টি সত্তার অফুরন্ত উৎস ও আশ্রয় ও নিয়ামক। শুধু বহির্বিশ্ব নয়, আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধিও এই বিশ্ব-প্রপঞ্চেরই অন্তর্গত এবং সেই একই মহান্ শক্তিকেন্দ্র হইতেই অভিব্যক্ত ও তদ্দ্বারাই বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত। এই শক্তিময় বিশ্বের সকল শক্তির মূলীভূত ও আশ্রয়-স্বরূপ এই মহাশক্তিকে আমরা জড় বলতে পারি না, কারণ তিনি স্বরাট্ স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ স্বয়ংক্রিয়। ইহাই ত চৈতন্যের লক্ষণ। এই মহাশক্তির বিচিত্র আত্মপ্রকাশকে আমরা তাঁর স্বতন্ত্র ইচ্ছা ব'লে অভিহিত করতে পারি। সুতরাং সর্বকারণকারণ পরমসত্তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে চৈতন্যময়ী ও ইচ্ছাময়া মহাশক্তি ব'লে স্বীকার করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাঁকে স্বেচ্ছাময় অনন্তশক্তিমান চেতন পুরুষ বলতেও আপত্তি নাই। তাঁকেই ত ধর্মাচার্যগণ পরমেশ্বর ব'লে বর্ণন করেন ও উপাসনা করেন। ঈশ্বর ও ঐশী শক্তির মধ্যে ত কোন ভেদকল্পনা ঠিক নয়।

ধ্যান-যোগীর দেবাত্মশক্তি সাক্ষাৎকার

আধুনিক বিজ্ঞান-সাধকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিই জড়ের ও বহুত্বের মোহ থেকে নিজেদের বুদ্ধিকে মুক্ত ক'রে অশেষ বৈচিত্র্য সমন্বিত নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির একাত্মত্বের

সন্ধান পেয়েছেন এবং ইহার প্রাণকেন্দ্রে এক স্বতন্ত্র স্বপ্রতিষ্ঠ স্বপ্রকাশ স্বেচ্ছাময় অনন্ত শক্তিমান্ চেতন পুরুষ বা চৈতন্যময়ী মহাশক্তি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। ইহাই তাঁরা তাঁদের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার বলে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তাঁরা জড় জগতের সূক্ষ্ম গবেষণার ভিতর দিয়েই আধ্যাত্মিকতার ভূমিতে উপনীত হয়েছেন, বিশ্বপ্রপঞ্চের বিশেষ বিশেষ তথ্য ও সত্যের রহস্য অনুধাবন করতে করতেই অখিল বিশ্বের মূলীভূত এক অসীম অনন্ত চৈতন্যময় শক্তিসমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কিন্তু এই চৈতন্যময়ী স্বতন্ত্র মহাশক্তি তাঁদের বিচারমূলক পরোক্ষ জ্ঞানেরই বিষয় হয়েছেন; কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করা বা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা সম্ভব হয় নাই।

ভারতের মহাযোগিগণ—অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধকগণ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিশ্বপ্রপঞ্চে বিচিত্ররূপে অভিব্যক্ত ও সর্বানুস্যূত এই চৈতন্যময়ী মহাশক্তিকে নিজেদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এবং পরিদৃশ্যমান্ জগতের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তাঁর আত্মপ্রকাশ ও লীলাবিলাস আস্বাদন করেছেন, তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তা অনুভব করেছেন ও ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করেছেন। ভারতের বেদ ও উপনিষৎ, আগম ও ও তন্ত্র, পুরাণ ও ইতিহাস, কাব্য ও উপন্যাস, এরূপ অসংখ্য তত্ত্বদর্শী মহাযোগীর কাহিনী বর্ণন করেছেন, যাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দার্শনিক যুক্তিবিচারের অনুসন্ধেয় চরম তত্ত্বকে

কেবলমাত্র ধ্যান ও সমাধি যোগে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন নাই, তাঁকে প্রেমভক্তিযোগে বাস্তব জীবনের ব্যবহার ক্ষেত্রে নামায়ে এনে তাঁর সাথে একান্ত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধও অনুভব ও আস্বাদন করেছেন। বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব সেই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাশক্তিময় পুরুষোত্তমকে তাঁরা সকল শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়মনবুদ্ধির সম্মুখে নিতান্ত আপন জনরূপে সমুপস্থাপিত করে, সারা ভারতের চিন্তাধারা ভাবধারা জীবন ধারাকে জড়ের ও বহুত্বের মোহ থেকে উদ্ধার ক'রে উন্নত আধ্যাত্মিক স্তরে প্রবাহিত করেছেন।

জগতের মূলতত্ত্বকে তাঁরা শুধু "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"—রূপেই দেখেন নাই ও দেখান নাই। তাঁকে তাঁরা স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, প্রেমময় স্বামী, করুণাময় প্রভু, হৃদয়রঞ্জন পুত্র, হৃদয়নন্দিনী কন্যা, খেলার সাথী, রাজরাজেশ্বর, বিপদে রক্ষাকর্তা প্রভৃতি নানারূপে দেখেছেন, নানাভাবে আস্বাদন করেছেন, এবং জনসমাজকে বিচিত্র ভাবে তাঁর সহিত নিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করতে শিক্ষা দিয়েছেন। সেই সব জ্ঞানী ভক্ত প্রেমিক মহাযোগীদের সাধনা উপলব্ধি ও প্রচারের প্রভাবে, বিশ্বজগতের মূল কারণ সাধারণ সাধকদের পক্ষেও 'দূরাৎ সুদূরং' নহে। "তদ্ ইহ অন্তিকে চ"। সকলেই তাঁকে নিজেদের বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করতে অধিকারী।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্।" চৈতন্যময় পরমদেবতার স্বরূপভূতা যে মহাশক্তি নিজেরই অনন্ত

গুণদ্বারা,—নিজেরই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, বিচিত্র ঐশ্বর্যবীর্য, বিচিত্র জ্ঞান বল ক্রিয়া, বিচিত্র লীলাবিলাস দ্বারা—স্বপ্রসূত অশেষ বৈচিত্র্য সমাকীর্ণ বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে আপনার তাত্ত্বিক স্বরূপ চিরকাল নিজেই রহস্যাবৃত করে রেখেছেন, সেই মহাশক্তিকে তাঁরা (মহাযোগিগণ) ধ্যানযোগে অনুসন্ধানরত হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন,—ধ্যানযোগে চিত্তকে মলবিক্ষেপাবরণ মুক্ত করে তাঁরা নিজেদের অখণ্ড চেতনার মধ্যে সেই চৈতন্যময়ী মহাশক্তির পারমার্থিক স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছেন।

আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা ও ইন্দ্রিয়ানুগত মনবুদ্ধি দ্বারা বিশ্বজগতের যে পরিচয় লাভ করি, তাতে সেই "দেবাত্মশক্তির বিচিত্র গুণেরই পরিচয় প্রাপ্ত হই। সেই শক্তির খণ্ড খণ্ড আত্মপ্রকাশ ও ক্রিয়াকলাপেরই জ্ঞান লাভ করি। বৈজ্ঞানিক সব পদ্ধতিতে এই সম জ্ঞানের যতই সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা সম্পাদিত হোক, তাতে খণ্ড জ্ঞানই হয়ে থাকে, বিশেষ বিশেষ পরিচ্ছিন্ন বিষয়েরই জ্ঞান হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পরিণামশীল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের মূল উৎস ও মূল কেন্দ্র যে নির্বিশেষ অদ্বিতীয়া অখণ্ডা চিন্ময়ী মহাশক্তি, তাঁর পরিচয় লাভ সম্ভব হয় না। তার জন্য ধ্যানযোগে চেতনায় অখণ্ডত্ব সম্পাদন করা ও তাকে মলবিক্ষেপাবরণ মুক্ত করা আবশ্যক।

কঠোপনিষদের ঋষি যথার্থই বলেছেন যে, স্বয়ম্ভূ বিশ্ববিধাতা আমাদের সৃষ্টি করার সময় আমাদেব জ্ঞানের দরজাগুলিকে (ইন্দ্রিয়গুলিকে) বহির্মুখ ক'রে নির্ম্মল করে আমাদের উপর যেন একটা কঠোর দণ্ডবিধান ক'রে রেখেছেন। তার ফলে সব

সত্যের (জ্ঞেয় তত্ত্বের) শুধু বহিরাবরণ ও খণ্ডিত সোপাধিক আত্মপ্রকাশই আমরা দেখে থাকি, কোন তত্ত্বেরই অন্তরাত্মার পরিচয় আমরা পাই না। ধীর ব্যক্তিগণ নিজেদের সাধনা দ্বারা "আবৃতচক্ষু হ'য়ে ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধিকে অন্তর্মুখ ক'রে, 'প্রত্যগাত্মার' দর্শন লাভ করেন, নিজেদের ও সব জ্ঞেয় বিষয়ের তাত্ত্বিক স্বরূপের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধির স্বাভাবিক বহির্মুখীন বৃত্তিসমূহকে সুদৃঢ় সংকলন দ্বারা সুসংযত ও নিরুদ্ধ ক'রে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা তাদের খণ্ড খণ্ড বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত ক'রে, সমগ্র চেতনার অখণ্ডতা অন্তর্মুখীনতা ও আত্মসমাধানের সুনিয়ত অনুশীলনই ধ্যানযোগ। আমাদের চেতনা যখন খণ্ড খণ্ড বিষয়-বিলাসী সদাচঞ্চল ইন্দ্রিয় মনের অধীনতা থেকে আপনাকে মুক্ত ক'রে স্বীয় নিরাবরণ অচঞ্চল অখণ্ডতায় স্থিতিলাভ করে, তখনই আত্মার স্বরূপ ও বিশ্বপ্রকৃতির তাত্ত্বিক স্বরূপ,—সব শক্তি পরিণামের মূল উৎস ও প্রাণকেন্দ্র—এই বিশুদ্ধ চেতনায় প্রতিফলিত হয়। তখন বস্তুতঃ এই চেতনা এবং চৈতন্যময়ী মহাশক্তি অভিন্ন রূপেই অনুভবগোচর হয়। "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাংগতিম্" —যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপরসাদির আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে স্থির ভাবে অবস্থান করে, মনও বৃত্তিরহিত হ'য়ে নিশ্চলা স্থিতিলাভ করে, এবং বুদ্ধিরও ভেদ-বিচারাদি কোন চেষ্টাও থাকে না—ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধি সম যখন দ্বন্দ্ব রহিত হয়ে অখণ্ড চেতনায় পর্যবসিত হয়, তখনই মানবচেতনার পরমাগতি বা

পরমাস্থিতি,—তখনই পূর্ণজ্ঞানে পূর্ণকল্যাণে পূর্ণ আনন্দে প্রতিষ্ঠালাভ হয়।

নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের চরম ও পরম কারণের অনুসন্ধানে পুরুষকার-সম্পন্ন সাধক যখন ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধির বহির্মুখী প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে, তীব্র অনুরাগের সহিত নিবিড় ধ্যানযোগ অবলম্বনে আত্মচেতনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্যের ভূমিতে অধিরূঢ় হয়, তখন সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিতই তার ঐকাত্মানুভূতি হয় এবং নিজের আত্মার মধ্যেই সে বিশ্বজগতের অনন্ত শক্তিময় পরম কারণের সাক্ষাৎকার লাভ করে। স্বীয় চেতনার অভেদ ভূমিতেই সে অশেষ বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতিরও অভেদভূমি আবিষ্কার করে। ধ্যানযোগের পরিপক্ক অবস্থায় সমাধিতে চৈতন্যময়ী আত্মা ও শক্তিময়ী প্রকৃতির ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়,—দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, চেতন ও জড় সর্বতোভাবেই একাকার হয়ে প্রকাশ পায়। সেই প্রজ্ঞালোকিত চেতনা যখন আবার প্রাপঞ্চিক ভেদভূমিতে অবতরণ করে, তখন ইন্দ্রিয়মনবুদ্ধিও তাদের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে বাহ্যিক বৈচিত্র্যের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ ঐক্যও অনুভব করতে থাকে। তখন ভেদের মধ্যেও অভেদ দর্শন, বহুত্বের মধ্যেও একত্বদর্শন, রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের মধ্যেও আত্মদর্শন, প্রাকৃতিক নব কার্যকলাপের মধ্যেও আত্মাভিন্ন এক চৈতন্যময়ী মহাশক্তির দর্শন হয়।

ভারতের এক চিরস্মরণীয়া মহাযোগিনী নারী,—অম্ভৃন ঋষির কন্যা বাক্-দেবী, এইরূপে ধ্যানযোগে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত

ঐকাত্ম্য অনুভব ক'রে স্বতঃস্ফুর্ত অপূর্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সেই অনুভূতির যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাহাই ঋক্‌বেদের দেবী-সূক্ত বা 'বাক্‌-সূক্ত' নামে লিপিবদ্ধ হয়ে আজ পর্য্যন্তও তত্ত্বপিপাসু হিন্দু-গণের নিত্যপাঠ্য হয়ে আছে। বিশ্বপ্রকৃতির বিভিন্ন বিতানে যত প্রকার শক্তির অভিব্যক্তি চলছে, সর্বপ্রকার শক্তিপরিণাম-রূপ কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার অধিষ্ঠাতৃ-রূপে যে সব দেবতা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সব ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত কচ্ছেন, সকলের মধ্যে তিনি স্বীয় অনন্তশক্ত্যাধার আত্মারই প্রকাশ দেখেছেন। তিনি দেখেছেন ও ঘোষণা করেছেন যে, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার, সোম, ত্বষ্টা, পূষা, কর্ণ প্রভৃতি দেবতারূপে আমিই বিশ্বের সর্বত্র বিচরণ করি ও বিভিন্ন জাতীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করি। এই বিশ্বপ্রপঞ্চে যেখানে যে কোন শক্তির প্রকাশ,—বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রেই হোক বা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রেই হোক,—সর্বত্র আমারই শক্তির খেলা। আমারই স্বতন্ত্রা লীলাময়ী ইচ্ছাশক্তির বিলাসেই সারা জগতে সর্ববিধ ব্যাপার সুচারুরূপে নির্বাহিত হচ্ছে। আমি বিশ্বাতীত, আবার বিশ্বের সর্বত্রই আমারই মহিমা প্রকটিত, আমি বিশ্বরূপা।

বিশ্বের মূলীভূতা চৈতন্যময়ী পরমাশক্তির সহিত ঐকাত্ম্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, আরো অনেক মহাযোগিনী বাক্‌-দেবীর মতই সারা বিশ্বের যাবতীয় শক্তির খেলা,—আপনারই আত্মার অভিব্যক্তি ব'লে অনুভব ও বর্ণন করেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন,—যাঁরা যোগযুক্তাত্মা, তাঁরা বিশ্বের সব পদার্থকে নিজের মধ্যে এবং নিজেকে সব পদার্থের মধ্যে দর্শন ক'রে সর্বত্র

সমদর্শী হন, সব ব্যাপারে সমরস আস্বাদন করেন। পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ এই মহাযোগের দৃষ্টিতেই বিশ্ববৈচিত্র্যের সর্বত্র আপনারই অনন্ত বিভূতির পরিচয় দিয়েছেন এবং অর্জুনের দিব্য চক্ষু উন্মীলিত ক'রে আপনার বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছেন। আমাদের চেতনা পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হয়ে একাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, পরমাত্মাকেই অনন্ত শক্তির মূলাধার ব'লে উপলব্ধি করে তৎসূত্রে নিজেকেও অনন্তশক্তির আধার ব'লে অনুভব করে।

মূলতত্ত্ব—চৈতন্যময়ী মহাশক্তি

সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের যে মূল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকগণ পরোক্ষভাবে অনুসন্ধান করেন, দার্শনিকগণ যুক্তিবিচার দ্বারা প্রতিপাদন করতে চেষ্টা করেন, এবং জ্ঞানী ভক্ত মহাযোগিগণ ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন, তাঁকে মহাশক্তিময়ী চৈতন্যসত্তা বা ব্রহ্ম বা পরমাত্মাও বলা হয়ে থাকে, চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাদেবীও বলা হয়ে থাকে। বস্তুতঃ চৈতন্য ও শক্তির মধ্যে ভেদ নাই। চৈতন্যকে শক্তিমান্ ব'লে শক্তির সহিত একটা অবান্তর ভেদ কল্পনা করে দার্শনিক বিচারের জটিলতা সৃষ্টি করা অনেক দর্শনাচার্য্য আবশ্যক বোধ করতে পারেন, এবং এই ভেদের মধ্যে তাহাদের নিত্যমিলনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে তাঁরা ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তি ও বস্তু—শক্তি ও শক্তিমান্-এর ভেদ অনেকটা নিরসন ক'রে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। বাস্তবিক পক্ষে শক্তি ও বস্তুর কোন ভেদ নাই। শক্তির ভিতরেই বস্তুর সব পরিচয়। শক্তির ঘনীভূত অবস্থার নামই বস্তু এবং বস্তুর

ক্রিয়াহীন অবস্থার নামই শক্তি। বস্তুর তটস্থ লক্ষণ সব বাদ দিলে স্বরূপ লক্ষণ অর্থাৎ শক্তিহীন লক্ষণ শূন্যেই পর্য্যবসিত হয়। বস্তুর ভিতরে যখন স্বপ্রকাশ জ্ঞানশক্তি বা অনুভব শক্তির এবং স্বতন্ত্রা ক্রিয়াশক্তি বা আত্মপরিণামশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তখনই সেই শক্তিকে চৈতন্যশক্তি এবং তদাধার বস্তুকে চৈতন্য-স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ"—ইহা চৈতন্যস্বরূপেরই বাস্তব লক্ষণ।

শক্তিপরিণামময় এই বিশ্বজগতের মূলকারণ বা মূলতত্ত্বকে অভিন্নশক্তি শক্তিমান চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম বলেও ধারণা করা চলে, কিংবা নিত্যা স্বতন্ত্রা আত্মপ্রকাশ-স্বভাবা চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাদেবী ব'লেও ধারণা করা চলে। পরমাত্মা বা ব্রহ্মই মহাশক্তি, মহাশক্তিই ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। বৈদিক ও বৈদান্তিক পরিভাষায় এই মূল তত্ত্বকে ব্রহ্মবস্তু বা পরমাত্মা ব'লে ধারণা ধ্যান ও উপাসনা করাই সাধারণ নিয়ম, এবং তাঁর স্বরূপ-ভূতা মহাশক্তিকে নিত্য তদাশ্রিতা ব'লে নির্দ্ধারণ করা হয়। আগমিক ও তান্ত্রিক ধারায় এই একই অদ্বয় মূল তত্ত্বকে চৈতন্য-ব্রহ্ম স্বরূপিণী মহাশক্তি মহাদেবী মহামায়া রূপে ধারণা ধ্যান ও উপাসনা করা সাধারণ বিধি। সেই মূল তত্ত্বকে বিশ্বজনক বলাও যে কথা, বিশ্বজননী বলাও সেই কথা, কারণ সেখানে লিঙ্গভেদের কোন প্রশ্নই নাই। লিঙ্গভেদ শুধু তৎপ্রসূত প্রাণিজগতে; সমগ্র কার্যজগতের অভেদভূমি ও মূলকারণের স্বরূপে কোন লিঙ্গভেদ অকল্পনীয়; পুরাণাদিতে ও উপাসক সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে উভয় ধারারই মিলন মিশ্রণ হয়েছে।

ব্রহ্মতত্ত্বকেও তারা নানারূপে নানা নামে নানাভাবে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অগোচর ভূমি থেকে আমাদের অতি নিকটে হৃদয়ের সামনে নামায়ে এনে উপস্থিত করেছে, মহাশক্তি তত্ত্বকেও তেমনি করেছে। দার্শনিক যুক্তিতেই তাদের উপাসনা আরাধনা পূজার্চনা ধ্যানধারণা ও উপলব্ধির কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই।

সর্বকারণ চৈতন্যময়ী মহাশক্তি বা মহাশক্তিময়ী চৈতন্যসত্তার স্বরূপের মধ্যেই দুইটি ভাবের নিত্যযুগল মিলন,—একটি আত্ম-সমাহিতভাব ও একটি বিচিত্ররূপে লীলায়িত ভাব। আত্ম-সমাহিত ভাবে তিনি নিত্যই "নিস্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" "একামবাদ্বিতীয়ম্" "প্রজ্ঞানমানন্দম্" ব্রহ্মা বা পরমপুরুষ। লীলায়িতভাবে তিনি নিত্যই সগুণা সক্রিয়া সদাপরিণামিনী বিচিত্র রূপ-রূপান্তধারিণী বিচিত্রভাব বিলাসিনী সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়বিধাত্রী পরমাপ্রকৃতি মহামায়া মহাদেবী। একটি তাঁর দেশকালাতীত দ্বন্দ্বাতীত ভাবাতীত ভাব, আর একটি তাঁর সর্বদেশে সর্বকালে বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও ভাববিলাসের মধ্যে নিয়ত অভিবন্দ্যমান ভাব। "তদেজতি তন্নৈজতি"—দুইটি ভাবই তাঁর স্বরূপগত,—নিত্যযুগলমূর্ত্তি।

সমস্ত জীব ও জগতের যিনি মূলকারণ, মূলতত্ত্ব, মূল অভেদভূমি, তিনি নিত্য নির্গুণ ও নিত্য সগুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয় ও নিত্য সক্রিয়, নিত্য আত্মসমাহিত ও নিত্য আত্মপরিণামী, নিত্য transcendent ও নিত্য dynamic. এই আপাতবিরোধী দ্বিবিধ ভাবের পরস্পরালিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মিলনই তাঁর যথার্থ স্বরূপ। তাই তিনি সব ভেদের অভেদ ভূমি, সব দ্বৈতের

অদ্বৈত ভূমি। সেই হেতু তত্ত্বদর্শী মহাযোগিগণ তাঁকে দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ ভাবাভাববিনির্মুক্ত প্রভৃতিরূপে বর্ণন করেন। যে সব সাধক জ্ঞান ভক্তি ও ধ্যানযোগে সম্যক্‌ভাবে যোগযুক্তাত্মা হয়ে সেই পরম তত্ত্বের সহিত ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তাঁরাও অন্তরে বাহিরে তাঁর এই যুগলমূর্ত্তি দর্শন ও আস্বাদন করেন। তাঁরা নিজেরাও অন্তরে আত্মসমাহিত থেকেই বিশ্বজগতে এক অচিন্ত্যশক্তিময় সচ্চিদানন্দঘন পরম তত্ত্বেরই বিচিত্র রূপ ভাব ক্রিয়া ও লীলাবিলাস সম্ভোগ করেন এবং নিজেকেও সেই সকলের ভিতরেই প্রতিফলিত দেখেন।

চৈতন্যময়ী মহাশক্তি যখন ইচ্ছাশূন্য ক্রিয়াশূন্য ভাববিলাস-শূন্য আত্মসমাহিত অবস্থায় বিরাজমান থাকেন, তখন বিশুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপে বা নির্গুণ ব্রহ্ম-স্বরূপেই তাঁর অবস্থিতি হয়। তাঁর শক্তিভাব তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যভাবের মধ্যে অন্তর্লীন। তাঁর অনন্ত মহিমার তখন কোন পরিচয় নাই। ক্রিয়ার মাধ্যমেই শক্তির আত্মপরিচয়। জ্ঞানবৃত্তিও ক্রিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। যখন কোনরূপ ক্রিয়া না থাকে, তখন চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে জ্ঞানবৃত্তিও থাকে না। আর কতভাবে শক্তির যে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা তাঁর স্বরূপের মধ্যে নিহিত আছে, তার ত কোন পরিচয়ই মিলে না। তিনি যেন তখন নিজেকেও নিজে জানেন না, তাঁর অনন্তরূপে আত্মাভিব্যক্তির সামর্থ্যের জ্ঞানও যেন তাঁর নাই। তিনি তখন স্বয়ংপূর্ণ বটেন ও সেই হেতু পরমানন্দ স্বরূপে বিরাজমানও বটেন। কিন্তু তিনি অদ্বয় স্বরূপে অবস্থিত, তাঁর অনন্ত ভাব, অনন্ত সামর্থ্য, অনন্ত বীর্য্যৈশ্বর্য্য, অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য

(খ)

তাঁর আত্মসমাহিত স্বরূপে অভিন্নরূপে, একীভূতরূপে অপ্রকাশিত-রূপে বর্তমান।

এই বিশ্বজগৎ দেখেই আমরা সেই অবিচিন্ত্যমহিমাময়ী মহাশক্তির পরিচয় লাভ করি। এই নিয়ত পরিণামশীল বিশাল জগতে আমরা সেই মহাদেবীর অপূর্ব্ব সৃজনী শক্তি অপূর্ব্ব পালিনী ও সামঞ্জস্যবিধায়িনী শক্তি, ও তৎসঙ্গে অদ্ভুত সংহারিণী অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সকলের বিলয়কারিণী-শক্তির পরিচয় পাই, এবং তাঁকে বিশ্বজননী বিশ্বপালিনী ও বিশ্বসংহারিণী আখ্যা দিয়ে থাকি। অনাদি অনন্তকাল এই তিনভাবে তাঁর অভিব্যক্তি দেখে তাঁকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র, কিংবা ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী শক্তিরূপে বর্ণন করে থাকি। এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের বিচিত্র শক্তি-পরিণামের মধ্যে অনন্ত প্রকার ঐশ্বর্য্যের ও বীর্য্যের, অনন্ত প্রকার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের, অনন্ত প্রকার জ্ঞান প্রেম ও রস-বিলাসের পরিচয় পেয়ে তাঁকে আমরা অনন্ত বীর্য্যৈশ্বর্যময়ী, অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যময়ী, অনন্ত জ্ঞানপ্রেমময়ী, অনন্ত রসবিলাসময়ী ভগবতী মহাদেবী বলে ধারণা ও উপাসনা করে থাকি। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর এই স্থূল জগৎই শুধু মহাশক্তিপ্রসূত বিশ্বজগৎ নয়। আরো কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম জগৎ আছে, জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো কত প্রাণজগৎ মনোজগৎ বুদ্ধিজগৎ আছে, কত ভাবময় জগৎ, রসময় জগৎ, ধর্ম্মময় জগৎ আছে। সকলের মধ্যেই সেই একই অদ্বিতীয়া চৈতন্যময়ী মহাশক্তির আত্মপ্রকাশ, সব জগতেরই তিনি অভেদভূমি ও নিত্য উৎস।

অনন্ত রস-বিলাসিনী নিয়ত সৃজন-পালন-ধ্বংস-কারিণী ভগবতী মহামায়া তাঁর এই বিশ্বরূপে আত্মপ্রকাশের মধ্যে অনন্ত ভাবের অনন্ত রসের অনন্ত ভাঙা-গড়ার খেলা নিত্যকাল খেলে চলেছেন, অথচ অন্তরে তিনি নিত্য আত্মসমাহিত। আত্মসমাহিত পরম শিবের বুকের উপর মহাকালীর বিচিত্র নৃত্য, এই চিত্রটী পরম তত্ত্বের এই স্বরূপটীকেই অদ্ভুত ভাবে রূপায়িত করেছে। শিব্য সেই মহাশক্তিরই আত্মসমাহিত ভাব, তাঁহাতে নিত্য অধিষ্ঠিত থেকেই মহাশক্তি আপনাকে বিশ্বপ্রপঞ্চে অনন্ত ভাবে লীলায়িত কচ্ছেন। শিবের বক্ষ থেকে তাঁহার চরণ কখনো স্খলিত হয় না, আত্মসমাহিত পরম ভাব থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হন না, অথচ তাঁর এই বিশ্বলীলায় তিনি অনবরত নেচে নেচেই চলেছেন, অবিরাম বিচিত্র ভাবে নানাবিধ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে আপনাকে অভিব্যক্ত কচ্ছেন, অবিরাম অসংখ্য প্রকার জীব ও জড়ের—ভোক্তা ও ভোগ্যের—সৃষ্টি কচ্ছেন, তাদের সযত্নে পোষণ কচ্ছেন, আবার সংহার ক'রে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিচ্ছেন। স্ব-স্বরূপে সমাধি ও বিচিত্র রূপে আত্মাভিব্যক্তি —ইহাই বিশ্বজননী মহাশক্তির নিত্যস্বভাব। ইহাই পরব্রহ্মের ঐশ্বর যোগ,—'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'।

এই বিচিত্র দ্বন্দ্বময় জগতে মনুষ্যোচিত বিচার বুদ্ধিতে আমরা ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের, সুন্দর ও কুৎসিতের, শ্রেয় ও অশ্রেয়ের উপাদেয় ও হেয়ের বিভাগ ক'রে থাকি। যদিও সবই সেই বিশ্বজননী শিবময়ী মহাশক্তিরই আত্মপ্রকাশ, তথাপি যাকে ধর্ম্ম সুন্দর ও শ্রেয় বোধ করি, তা আমাদের ইপ্সিত, এবং যা কিছু

অধর্ম্ম অসুন্দর অশ্রেয় বোধ করি, তা আমাদের অনীপ্সিত। মানুষের অন্তরে এই যে বিবেকবোধ, ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ উচিতানুচিত-বোধ, ইহাও মহাশক্তিরই এক বিশেষ খেলা। পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ প্রেমে, পূর্ণ যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বজননী মহাশক্তির সর্ব্বপ্রকার আত্মপ্রকাশ ও লীলাবিলাসের মধ্যে আমরা 'সমরস' আস্বাদন করতে সমর্থ হই না, তাঁর সকল প্রকার রূপ রূপান্তর পরিগ্রহের মধ্যে তাঁর কল্যাণতম সুন্দরতম মাধুর্য-মণ্ডিত মুখখানি আমরা দেখতে পাই না। সেই হেতু আমরা তাঁর এক জাতীয় রূপের বা আত্মপ্রকাশের জয় বা প্রাদুর্ভাব প্রার্থনা করি, অপর জাতীয় রূপের বা আত্মপ্রকাশের পরাজয় বা বিনাশ কামনা করি। তাঁর দৈবভাবে আত্মপ্রকাশ আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাঁর আসুর ভাবে আত্মপ্রকাশ আমাদিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করে। যদিও একই শিবাত্মভূতা মহাশক্তি মহাদেবী ও মহাসুরী রূপে তাঁর বিশ্বলীলায় আত্মপ্রকাশ কচ্ছেন,—যিনি দেবজননী, তিনিই অসুরজননী,—তথাপি আমরা আমাদের জীবনাদর্শ অনুসারে তাঁকে দেবপক্ষপাতিনী ও অসুর-বিনাশিনী মূর্ত্তিতেই দেখতে সর্বদা অভিলাষী।

যেখানে দম্ভ দর্প অভিমান ক্রোধ পারুষ্য ভোগলালসা প্রভুত্ব-প্রিয়তা, সেখানেই অধর্ম্ম ও অসুর ভাব; যেখানে অমানিত্ব অদম্ভিত্ব অহিংসা ক্ষমা আর্জব ত্যাগস্পৃহা সেবাপ্রবৃত্তি, সেখানেই ধর্ম্ম ও দৈব ভাব। চিরকাল এই সংসারে ভগবতী মহামায়া দ্বিবিধ ভাবেরই সৃজন ও পোষণ কচ্ছেন এবং কখনো অসুরভাবকে বাড়ায়ে তোলেন ও দৈব ভাবকে নির্য্যাতিত করেন, কখনো বা

দৈবভাবকে প্রবল করে অসুরভাবকে পরাভূত করেন;—ইহাই দেখতে পাই। কিন্তু আমাদের প্রাণ চায় অসুরভাবের বিনাশ ও দৈবভাবের অভ্যুদয়। অসুরভাবের বৃদ্ধিতে জগতে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি, অবিচার ও অত্যাচার প্রবল আকার ধারণ করে, ধর্ম্মের মর্যাদা নষ্ট হয়, পরম তত্ত্বের অনুসন্ধানের দিকে অনুরাগ থাকে না। সুতরাং কল্যাণপিপাসু ধর্ম্মপিপাসু শান্তিপিপাসু সাধকগণ সর্বদা অসুরভাবের পরাভব ও দৈবভাবের প্রভাব-বৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করেন, এবং বিশ্বজননী মহাশক্তিকে দৈবভাবের আনুকূল্য করার জন্য প্রার্থনাপরায়ণ হন।

মানুষ বাস্তব জীবনে সাধারণতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের—দৈবভাব ও আসুর ভাবের সাত্ত্বিক ও রাজস-তামস শক্তিসমূহের—নিয়ত সংঘর্ষের মধ্যেই বাস করে। বিবেকসম্পন্ন তত্ত্বপ্রধান মনুষ্যগণ এই সংঘর্ষে অতিষ্ঠ হয়ে বিশ্বজননী মহাশক্তিকে তাদের সম্মুখে অসুরমর্দিনী ধর্ম্মসংস্থাপিনী বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী নিঃশেষ-দেবগণ-শক্তি-সমূহমূর্ত্তি-রূপে আবির্ভূত হবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করেন এবং এই মূর্ত্তিতেই হৃদয়মন্দিরে তাঁর পূজা করেন। আপনাদের পুরুষকার দ্বারা সামর্থ্যানুসারে সব আসুরিক ও তামসিক শক্তি-সমূহকে বলি প্রদান করে নিজেদের ভিতরে দৈব শক্তিকে বলবতী করবার জন্যে তাঁরা প্রয়াসী হন। এই সাধনসংগ্রামে জয়ী হ'লে তাঁদের জীবনে সত্ত্বগুণ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে, মনবুদ্ধি হৃদয় ক্রমশঃ উন্নততর আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরোহণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞানালোকিত হয়। সাধকের চিত্তে তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভাসিত হ'লেই মহাশক্তির যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হয় এবং সমগ্রবিশ্ব-

প্রকৃতি অভিনব রূপলাবণ্য-সমন্বিত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবীর্য্যৈশ্বর্য্য-সুশোভিত আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। তখন সাধকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় যে, এই অশেষবৈচিত্র্যময়ী বিশ্বপ্রকৃতির মস্তকোপরি (অর্থাৎ জীবনকেন্দ্রে) আত্মসমাহিত স্বয়ংপূর্ণ শিবসুন্দর স্বমহিমায় বিরাজমান, তাঁহারই আত্মপ্রকাশরূপা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী মহাদেবী বিচিত্রায়ুধবিশিষ্ট (অনন্তশক্তি বিশিষ্ট) সহস্রভুজ প্রসারিত করে বিশ্বপ্রপঞ্চের ক্ষুদ্রবৃহৎ যাবতীয় পদার্থ সুনিয়ন্ত্রিত করেন এবং সৃষ্টিপালনসংহারাদি যাবতীয় ব্যাপার সংসাধিত করেন; তাঁর এই বিশ্বলীলায় যত পাশবিক ও আসুরিক শক্তি, যত রাজস ও তামস প্রকৃতি, যত ধর্ম্মবিরোধী সাম্যশৃঙ্খলা-বিপর্য্যয়কারী অশুভ প্রভাব তিনি প্রসব ও পোষণ করছেন, সব তাঁরই চরণতলে তাঁর খেলার পুতুল হয়ে তাঁরই বিধান অনুসারে তাঁরই প্রেরণায় ও তাঁরই শক্তিতে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন ক'রে তাঁর বিশ্বলীলার নানারূপ গৌরব ও শোভাই বর্দ্ধন করছে, দৈবী সম্পদ্‌সমূহে তাঁর স্নেহপুষ্ট জ্ঞানবীর্য্যসৌন্দর্য্যৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট পুত্র-কন্যারূপে তাঁর কোলের কাছে বিশ্বপ্রপঞ্চে খেলা করছে; সারা বিশ্বজগৎ যেন আনন্দে নৃত্য করে চলেছে। বাংলার শারদীয় মহোৎসবে পূজিত আনন্দময়ী মা দুর্গার মহিমময়ী মূর্ত্তির মধ্যে এরূপ একটি তত্ত্বানুভূতির পরিচয় বিদ্যমান।

সাধক যতই জ্ঞান ভক্তি ও যোগের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করেন, তাঁর চিত্ত যতই মলবিক্ষেপাবরণমুক্ত শুদ্ধসত্ত্বময় জ্ঞানভক্তিপ্রেমোজ্জ্বল হয়, ততই তাঁর দৃষ্টিতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যাবতীয় ব্যাপারের মধ্যে সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য অধিকমাত্রায় প্রকটিত

হতে থাকে, সব বীর্য্যৈশ্বর্য্যের পরিচায়ক ব্যাপারগুলিও সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যেরই অঙ্গীভূত হয়ে আভরণরূপে প্রতিভাত হয়, এবং এই বিশ্বজগতের মূলীভূতা অনন্তবীর্য্যৈশ্বর্য্যময়ী মহাশক্তি তাঁহার নিকট বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী প্রেমানন্দময়ী আত্মহ্লাদিনী আত্মবিলাসিনী মহাশক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। আগমনিগম পুরাণতন্ত্রাদিতে মহাশক্তির সর্বস্তরের পরিচয় বিদ্যমান।

পরম ভাবগত সর্বশাস্ত্রমর্মার্থদর্শী শ্রীমান্ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী 'চণ্ডী-চিন্তা' গ্রন্থে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যের যে চমৎকার তত্ত্ববিশ্লেষণ করেছেন, তাহা ভাষার লালিত্যে, ভাবের গাম্ভীর্য্যে, যুক্তির নৈপুণ্যে, অনুভূতির প্রগাঢ়তায়, সকলেরই হৃদয়াকর্ষক হবে, নিঃসন্দেহ। তিনি শুধু আমাকে কিছু গৌরবদান করার জন্যই বোধ হয় তাঁর এই অমূল্য স্বল্পায়তন গ্রন্থখানির একটি ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছেন। অমানীকে মানদান বৈষ্ণবের ধর্ম। তিনি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ ও পরম প্রেমাস্পদ। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষার্থেই নিজের অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমার চিন্তাধারার কিঞ্চিৎ তাঁর চিন্তাধারার সহিত যুক্ত করিলাম। ব্রহ্মচারিজীর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থখানিও যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভক্তদের নিকট বিশেষ সমাদৃত হবে, এতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

—০—

প্রাক্-কথন

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজি মহারাজের "চণ্ডী-চিন্তা" প্রকাশ করিতে যাইয়া আমারা শুধু এই মাত্র বলিতে চাই, 'চণ্ডী-তত্ত্বের' এইরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা একমাত্র তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সাধনা—সাধনার ফল অনুভূতি। সেই অনুভূতিই "চণ্ডী-চিন্তা" নামক গ্রন্থে অপূর্ব্ব ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। কাজেই বিশ্বজননীর আদরের দুলাল—মাতৃপূজার একনিষ্ঠ সাধক বাঙ্গালী যে এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ দর্শনে তৃপ্ত হইবেন—উপকৃত হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থের প্রথম নামকরণ করা হইয়াছিল, "চণ্ডী-চিন্তন।" "চণ্ডী-চিন্তন" ছাপা যখন প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা গেল—ইতিমধ্যে "চণ্ডী-চিন্তন" নামে অপর একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। একই নামে দুই গ্রন্থ হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমরা গ্রন্থের নূতন নামকরণ করিলাম "চণ্ডী-চিন্তা।"

মূল গ্রন্থে চণ্ডীতত্ত্ব—মায়ের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা তত্ত্বের পরে চণ্ডীর তথ্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। চণ্ডীর বিষয়বস্তু অবগত হইলে, তাহা "চণ্ডীতত্ত্ব" বুঝিবার সহায়ক হইবে, কারণ তত্ত্ব এবং তথ্য লইয়াই বস্তুর স্বরূপ।

শ্রীশ্রীচণ্ডী মূলগ্রন্থ নহে। ইহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১তম অধ্যায়

হইতে ৯৩তম অধ্যায় লইয়া এই গ্রন্থ। দেবী-ম্যহাত্ম্য এবং দুর্গাসপ্তশতী নামেও ইহা আখ্যাত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ৭০০ শত মন্ত্র বা ৫৭৮টি শ্লোক আছে।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশোদ্ভব মহারাজা সুরথ সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। ধর্ম্মপ্রাণ, পুণ্যবান রাজা সুরথের রাজত্বে প্রজাকুল সুখে ও শান্তিতে বাস করিত; কারণ পুণ্যের ফল সুখ। রাজার পুণ্যেই রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি।

সৃষ্টি পরিবর্ত্তনশীল। সুখ দুঃখ এবং পতন উত্থান একের পর আর আসিয়া থাকে। রাজা সুরথেরও ভাগ্যাকাশ দুঃখের অমানিশায় ছাইয়া ফেলিল—তাঁহার সুখসূর্য্য অস্তমিত হইল। তিনি শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া শুধু রাজ্যই হারাইলেন না, ভাগ্যবিড়ম্বনায় স্ত্রী পুত্র অমাত্যগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া মনের দুঃখে বনে গমন করিলেন।

সেই বনে ছিল মেধসমুনির আশ্রম। মুনি তাঁহাকে পরম আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। মনোরম সেই আশ্রম। শান্ত-রসাস্পদ সেই আশ্রমে হিংস্র জন্তু তাহার হিংসা ভুলিয়াছে। বৈরিতার লেশ মাত্র কোথাও নাই। রাজা সুরথ আশ্রমবাসী, কিন্তু তাঁহার মনে শান্তি নাই। স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের চিন্তায় তিনি কাতর-হৃদয়। শান্তিহারা হৃদয় লইয়া তিনি বনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন এইরূপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় বিষণ্ণমুখ, দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয় এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকট আগাইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"বন্ধো! দেখিতেছি

আপনার মলিন মুখ—বিষণ্ণ হৃদয়। ইহার কারণ কি? আপনি এই নির্জ্জন বনেই বা আসিয়াছেন কেন?” রাজার প্রীতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে নবাগতের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহাকে একান্ত আপনজন বলিয়া বোধ হইল। আপনজনের নিকট কথা বলিয়া মনের দুঃখ লাঘব হয়। নবাগত বলিতে লাগিলেন—“আমার নাম সমাধি! বৈশ্যকুলে আমার জন্ম। প্রচুর ধনসম্পদের আমি অধিকারী ছিলাম। গৃহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু দৈবপ্রতিকূলে স্ত্রী পুত্র আমার প্রতি বিরূপ হইল। স্ত্রী পতিপ্রেম, পুত্র পিতৃভক্তি, আত্মীয় বন্ধুবর্গ স্বজন-প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়া ছলে বলে কৌশলে আমার সমস্ত অর্থ বিত্ত অপহরণ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। “যথারণ্যম্ তথাগৃহম্”—তাই মনের দুঃখে আমি বনে আসিয়াছি। কিন্তু বনে আসিয়াও আমি স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের কথা ভুলিতে পারিতেছি না। তাহাদের কোন খবর না পাইয়া আমার হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। তাহারা সুখে আছে কি দুঃখে আছে জানিতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি—কিছুতেই মনে শান্তি পাইতেছি না।” রাজা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—“যাহাদের কর্ত্তৃক আপনি বঞ্চিত, নিপীড়িত ও গৃহ হইতে তাড়িত হইয়াছেন, যাহারা আপনার প্রতি মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে—তাহাদেরই মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তায় আপনি কাতর হইতেছেন কেন?” “হাঁ, আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কি জানি কেন আমার মন কিছুতেই তাহাদের প্রতি নির্দ্দয় হইতেছে না—“কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ।” (১।৩০)

রাজা সুরথের অবস্থাও তদ্রূপই। কাজেই সমদুঃখী উভয়ের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। লাঞ্ছিত হইয়াও লাঞ্ছনাকারীর প্রতি মন কেন বিরূপ হয় না, এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে বহু আলোচনা হইল; কিন্তু তাঁহারা ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে তাঁহারা মেধসমুনির নিকট যাইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। বলিলেন—"মুনিবর! বিষয়ের দোষ অবগত আছি। বিষয় যে দুঃখ-প্রদ তাহা আমরা জানি। যাহাদের আপন মনে করি তাহারা যে কেহই আপন নয়, সে অভিজ্ঞতাও আমাদের হইয়াছে। তবুও তাহাদেরই মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় আমরা অভিভূত—শান্তিহীন জীবন যাপন করিতেছি। ইহার কারণ কি?" তদুত্তরে মুনি বলিলেন—"সন্তানস্নেহই ইহার কারণ। শুধু মনুষ্য নহে, পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এই অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া স্বীয় আহার্য্য নিজে অভুক্ত থাকিয়াও আপন সন্তানের মুখে তুলিয়া দেয়। এ দৃশ্য কি দেখিতে পান না? ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। মহামায়া এই অপত্য স্নেহের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল জীবকে এই অপত্যস্নেহে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। জগৎপতি হরিরও ইনি যোগনিদ্রারূপিণী। এই মহামায়ারূপিণী দেবী ভগবতী শুধু বিবেকহীনের নহে—বিবেকিগণেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করিয়া থাকেন—

'জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ (১।৫৬)

এই দেবীই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ। চরাচর সমস্ত বিশ্ব তাঁহার

সৃষ্টি—'ত্বয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্'। ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সনাতনী এই দেবীই সংসার-বন্ধন এবং মুক্তির হেতুভূতা।" অশ্রুতপূর্ব্ব দেবীর কথা শুনিয়া উভয়ের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মুনি বলিলেন—"এই দেবী নিত্যা। তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই; সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া দেবী বিরাজমানা—'ত্বয়া সর্ব্বমিদং ততম্।' জন্মমৃত্যু-বিহীনা এই দেবী দেবগণের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। নিত্যা হইলেও তখন তাঁহাকে উৎপন্ন বলিয়া বলা হয়।—"উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।" দেবীর জন্ম কর্ম্ম যেমন অভূতপূর্ব্ব তেমনি বিস্ময়কর। বলিতেছি শ্রবণ করুন—"একদা ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়কালে কারণার্ণবে অনন্ত-শয্যায় যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলেন। সেই সময় তাঁহার কর্ণমল হইতে দুইটি অসুর জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম মধু ও কৈটভ। অসুরদ্বয় জন্মিয়াই বিষ্ণুর নাভি-কমলস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত। ভয়ে ভীত ব্রহ্মা আত্মরক্ষার উপায়ন্তর না দেখিয়া বিষ্ণুকে জাগ্রত করিবার জন্য যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ায় স্তব করিতে থাকেন। স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী বিষ্ণুকে ত্যাগ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু জাগ্রত হইলেন। অসুরদ্বয়কে ব্রহ্মার বধে উদ্যত দেখিয়া বিষ্ণু তাহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্ধর্ষ অসুরদ্বয় বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বিষ্ণুকে বলিলেন—"হে বিষ্ণো! তোমার সঙ্গে যুদ্ধে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।" তখন দেবমায়ায় মোহিত অসুরদ্বয় এমনি করিয়া নিজের মৃত্যুশেল অন্যের হাতে তুলিয়া

দিতে উদ্যত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—"তোমরা আমার বধ্য হও।" তখন অসুরদ্বয় এই বরদানের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিতে লাগিল। দেখিল চতুর্দ্দিক জলময়— ভাবিল সত্যরক্ষার্থ প্রার্থিত বর অবশ্যই দিতে হইবে, অথচ মৃত্যুকেও এড়াইতে হইবে। বলিল—"বেশ কথা, আমরা তোমার বধ্য হইব, কিন্তু এমন স্থানে বধ কর, যেখানে জল নাই।" তাঁহারা ভাবিয়াছিল জলহীন স্থান যখন কোথাও দৃষ্ট হইতেছে না, তখন মৃত্যুবর দিয়াও তাহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইল।

কিন্তু বিষ্ণুকে জলহীন স্থান খুঁজিতে হইল না, স্বীয় উরুদেশে অসুরদ্বয়কে স্থাপন করিয়া চক্রের দ্বারা তাহাদের মস্তক ছেদন করিলেন।

বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী এই দেবীর নাম মহাকালী। ইঁহার বাহু দশ, পাদ দশ, মুখ দশ এবং বিশাল ত্রিংশৎ নয়ন। ইঁহা চণ্ডীর তামসী মূর্ত্তি। তিনি খড়্গ, বাণ, শূল, শঙ্খ, চক্র, ভুশুণ্ডি পরিঘ এবং শোণিতাক্ত নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার এই রূপ মহাভয়ঙ্করী—ভীমরূপা। অন্যদিকে আবার ইঁনিই রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও মহাশ্রীর প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার উপাসনায় সিদ্ধ সাধক অতুলনীয় বলে বলীয়ান হইয়া চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বশীভূত করিতে পারেন।

অন্য এক সময় দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া হরিহরের নিকট গমন করেন এবং নিজেদের পরাজয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়া অসুরবধের জন্য প্রার্থনা

করেন। দেবগণের পরাজয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া হরিহরের ভীষণ ক্রোধ উপজাত হইল। ক্রোধান্বিত হরিহরের বদনমণ্ডল হইতে সুমহৎ তেজোরাশি নির্গত হইতে লাগিল—সেই সময় দেবতাদের শরীর হইতেও তেজ নির্গত হইয়া ঐ তেজের সহিত মিলিত হইল। দিগন্তব্যাপী সেই তেজ হইতে এক নারীমূর্ত্তি জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র হইতে এক একটি অস্ত্র উৎপন্ন করিয়া দেবীকে অসুরবধে রণসাজে সজ্জিত করিলেন। দেবী দেবতাদের অভিপ্রায় অনুসারে অসুর সকলকে বধ করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিলেন। দেবতারা শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যথোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী দেবতাদিগকে বর দিতে চাহিলে, তাঁহারা বলিলেন—"হে দেবী! মহেশ্বরি! যদি আমাদিগকে বর দিতে ইচ্ছে করেন, তবে বিপদে পড়িয়া যখন যখন আপনাকে স্মরণ করিব তখন আপনি আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বর প্রদান করুন।" দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

এই দেবীর নাম মহালক্ষ্মী। সহস্র বাহুসমন্বিতা এই দেবী; কিন্তু অষ্টাদশভুজারূপেই ইনি সাধারণতঃ পূজিতা হইয়া থাকেন। পদ্মাসনা এই দেবী অক্ষমালা, কমণ্ডলু, পদ্ম, শঙ্খ, এবং নানাবিধ অস্ত্র অষ্টাদশ ভুজে ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহা দেবীর রাজসী মূর্ত্তি। কান্তি রূপ ও সৌভাগ্যশালিনী এই দেবী সর্ব্বদেবময়ী। ইঁহার সাধনায় সিদ্ধ হইলে সাধক সমস্ত লোক এবং দেবতাগণেরও প্রভুত্বলাভে সমর্থ হন।

অন্য এক সময় শুম্ভ নিশুম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দেবতারা স্বর্গরাজ্যচ্যুত হইলেন। দেবীর পূর্ব্বের বর তাঁহাদের স্মরণ হইল—বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিবেন। তাঁহারা তাই হিমালয় প্রদেশে গমন করতঃ দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় দেবী জাহ্নবীজলে স্নান করিতে আসিয়া দেবতাগণকে স্তবপরায়ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন?" এই সময় দেবীর শরীরকোষ হইতে এক শিবামূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—"দেবতারা আমারই স্তব করিতেছেন।" এই দেবীর নাম কৌশিকী। অপরূপ রূপশালিনী এই দেবী। তাঁহার অঙ্গশোভায় চতুর্দ্দিক মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড মুণ্ড সেখানে উপস্থিত ছিল। দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারা স্বীয় প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিল—"হিমালয় প্রদেশে এক নারীমূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন,—ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ত্রিভুবনে ইহার তুল্যা সুন্দরী রমণী দৃষ্ট হয় না। এই রমণী একমাত্র আপনাদেরই যোগ্যা। আপনারা ইহাকে বরণ করুন।" শুম্ভ নিশুম্ভ ভৃত্যের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তখনই দেবীর নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূত দেবীকে বলিল—"হে দেবী! আপনি যেরূপ রূপে গুণে অতুলনীয়া—অসুর রাজ শুম্ভ নিশুম্ভও তেমনি ত্রিজগতে সর্ব্ব বিষয়ে তুলনাবিহীন। আপনি তাঁহাদের পতিত্বে বরণ করুন। এই প্রস্তাব লইয়া আমি আসিয়াছি।" "হাঁ, তোমার

প্রস্তাব খুবই উত্তম। ত্রৈলোক্যাধিপতি শুম্ভ নিশুম্ভকে কোন নারী না পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিবে ? কিন্তু আমি পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিচার বিবেচনা না করিয়াই একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি, তাহাই এক্ষণে তোমার প্রস্তাব গ্রহণে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার প্রতিজ্ঞা হইল—

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলে লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ (৫।১২০)

—সংগ্রামে আমাকে যিনি জয় করিবেন এবং যিনি আমার গর্ব্ব চূর্ণ করিতে পারিবেন অথবা যিনি আমার তুল্য বলশালী হইবেন তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব। হে দূত ! তুমি আর বিলম্ব করিও না। আমার প্রতিজ্ঞার কথা যাইয়া তাঁহাদিগকে বল, তাঁহারা আসিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া আমাকে গ্রহণ করুক।" অসুররাজ দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন দেবীকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু ধূম্রলোচন দেবীর হস্তে নিহত হইল। আসিল চণ্ড মুণ্ড ; তাহাদিগকেও দেবী বধ করিলেন। আসিল প্রধান সেনাপতি রক্তবীজ—সেও আর ফিরিয়া গেল না। একের পর আর আসিতেছে,—আর মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আসিল নিশুম্ভ—সেও দেবীর হস্তে নিহত হইল। ভ্রাতৃবধে শুম্ভ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধ করিতে করিতে শুম্ভ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল, দেবীর অনুরূপ বহু মূর্ত্তি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইঁহারা কোথা হইতে আসিল ? দেবী ত একাই ছিলেন। ইহারা কে ? শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবীকে

বলিল,—"হে বলদর্পিতা দুর্গা! মিথ্যাই তোমার গর্ব্ব। তুমি সংগ্রামে অন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছ—তোমার গর্ব্ব করিবার কি আছে?" অসুর রাজের কথায় দেবী হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"সে কি? অন্য শক্তির কথা আবার কি বলিতেছ? এসমস্তই তো আমার শক্তি—আমারই বিভূতি। আমি ছাড়া জগতে আবার কে আছে?—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" (১০।৫)

রে দুষ্ট! এই দেখ, আমারই শক্তি ইহারা, আমাতেই বিলীন হইতেছে। আমিই স্বীয় শক্তিবলে ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছিলাম। —আবার আমিই নিজের মধ্যে ইহাদিগকে সংহরণ করিলাম আমি একাই বিদ্যমান আছি।" শুম্ভ দেখিল, বাস্তবিকই বহুমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়াছে। একমাত্র দেবীই সম্মুখে বিরাজমানা। শুম্ভ ভাবিতে লাগিল,—এই দেখিলাম বহু দেবী মূর্ত্তি যুদ্ধ করিতেছেন, আবার এখন দেখিতেছি, বহু নাই,—দেবী একা,—একাই বর্ত্তমান আছে। এ তো বড় বিস্ময়কর অদ্ভুত ব্যাপার! হাঁ, এই দেবী এক—আবার এই দেবীই বহু। একেরই এই বহুত্ব। একত্ব ও বহুত্বের সমন্বয়েই এই দেবীমূর্ত্তি। স্বেচ্ছাময়ী দেবী এক থাকিয়াও বহু হন—এই বহুত্বই সংসার। সংসারেও তিনিই বিরাজমানা—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু।" অবশেষে দেবী শুম্ভকেও বধ করিলেন। শত্রুবধে দেবতারা বিপন্মুক্ত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন—

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

হে দেবি! আপনি আশ্রিত, দীন এবং আর্ত্তগণের মুক্তিপ্রদায়িনী এবং ত্রিবিধ দুঃখের নাশকারিণী, আপনাকে নমস্কার। দেবতাগণের স্তবে দেবী সন্তুষ্টা হইলেন, বলিলেন—"হে দেবগণ! আমি বরদানে ইচ্ছুক, জগৎকল্যাণার্থ যে কোন বর তোমরা ইচ্ছা কর, তাহাই আমি তোমাদিগকে প্রদান করিব।" দেবতারা বলিলেন—"হে অখিলেশ্বরী! আপনি এক্ষণে যেরূপ আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া ত্রিভুবনে শান্তিবিধান করিলেন, ভবিষ্যতেও তদ্রূপ করিবেন এই প্রার্থনা করি।" দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। এই দেবীর নাম মহাসরস্বতী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ইঁনি সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি। অষ্টভুজা এই দেবী বাণ, মুষল, শূল, চক্র ঘণ্টা, হল ও ধনু ধারণ করিয়া আছেন। এই দেবীর সাধনায় সিদ্ধ সাধক সর্ব্বজ্ঞত্ব বরলাভ করিয়া থাকে—

"এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি "

এই দেবী অতুল প্রভবান্বিতা। যেমন তিনি মুক্তির হেতুভূতা, তেমনি সংসার-বন্ধনের কারণও তিনি। ভোগার্থীকে ভোগ এবং মোক্ষার্থীকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন। অপত্যস্নেহ দ্বারা যে আপনারা মোহাচ্ছন্ন হইয়াছেন, তাহাও এই দেবীরই কার্য্য। ইঁহার শরণাগত হউন, আপনাদের মোহান্ধকার দূরীভূত হইবে। ইহকালে সর্ব্ববিধ ভোগ ও পরকালে স্বর্গসুখ এবং মুক্তিও লাভ হইবে। সর্ব্বার্থসাধক এই দেবী—ইহাতে সন্দেহ করিবেন না।"

রাজা ও সমাধি উভয়েই দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেবীর আরাধনায় দৃঢ়সংকল্প হইয়া উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নদীর পুলিনদেশ দেবী-আরাধনার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া তথায় দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করতঃ উভয়ে দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কঠোর সে পূজা-আরাধনা—আত্মসমর্পণে নিজেকে নিঃশেষে মুছিয়া দিতে চেষ্টিত হইলেন। কখনও অর্দ্ধাহারে কখনও বা অনাহারে থাকিয়া পূজা হোম করিতেছেন। নানাবিধ দ্রব্য দ্বারা বলি প্রদান করিতেছেন। মায়ের পূজায় রক্ত চাই—কিন্তু পশু-রক্ত—অন্যের রক্ত নহে, স্বদেহনিঃসৃত রক্ত দেবীকে উপহার দিতেছেন। দিন, সপ্তাহ, মাস এমনি করিয়া তিন তিনটি বৎসর তাঁহারা সুকঠোর তপস্যা এবং পূজা-আরাধনার দ্বারা দেবীর সন্তোষ বিধান করিতে চেষ্টিত রহিয়াছেন। অবশেষে দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন, বলিলেন—"হে রাজন্। হে বৈশ্যকুলনন্দন! তোমরা যেরূপ বর লাভ করিতে ইচ্ছা কর, বল, আমি তাহাই তোমাদিগকে প্রদান করিব।" রাজা সুরথ জন্মান্তরে অক্ষয় রাজত্ব এবং ইহকালে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের বর প্রার্থনা করিলেন। দেবী তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করিলেন। বৈশ্য কিন্তু ভোগৈশ্বর্য্য চাহিলেন না, মহাপ্রাজ্ঞ সমাধি বলিলেন—"হে মাতঃ! স্ত্রীপুত্র-আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে মোহ সেই মোহবিনাশক তত্ত্ব-জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।" দেবী তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া বলিলেন—"হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ সমাধি! তোমার প্রার্থিত বরই প্রদান করিতেছি। মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মজ্ঞান তোমার লাভ হইবে।" উভয়েই স্ব স্ব বাঞ্ছিত বর লাভ করিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন।

দুর্গাপূজা ও কালীপূজা এই মহামায়ারই পূজা। ভুক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী এই দেবী সন্তুষ্টা হইলে সাধকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ইহ ও পরকালে তাঁহার অলভ্য কিছুই থাকে না। দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক এই চণ্ডীপাঠ অথবা শ্রবণ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ—

"সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।"

সর্ব্ব আপদের শ্রেষ্ঠ স্বস্ত্যয়ন এই দেবী-মাহাত্ম্যের কীর্ত্তন। দেশের আজ চরম দুর্দ্দিন। দেবীমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন দ্বারা তাহার দুর্দ্দিন ঘুচিবে—সকল আপদ দূরীভূত হইয়া সুদিন দেখা দিবে। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। তাই আমরা জন্মাষ্টমীর পুণ্য দিনে এই দেবী-মাহাত্ম্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর হস্তে তুলিয়া দিলাম। পাঠে তাঁহারা সুস্থ হউন, অনুভূতিতে স্বস্থ হউন এই প্রার্থনা। বক্তব্য শেষ করিতে যাইয়া দেবীকে প্রণাম নিবেদন করি—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি ! নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
ওঁ শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

—ওঁ তৎসৎ—

জন্মাষ্টমী
১৩৭০
সুদর্শন-কার্য্যালয়

ব্রহ্মচারী শিশির কুমার

—সূচী-পত্র—

—০—

চণ্ডী-চিন্তন

অর্জ্জুনের দুর্গাস্তব

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে দুর্য্যোধনের বিপুল সৈন্যসমাবেশ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের হিতের নিমিত্ত —'হিতার্থায়' বলিলেন—"পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয়" (মহাভাঃ ভীষ্মঃ-২৩।২)—শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব কর। রথ হইতে অবতরণ করিয়া অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া শ্রীশ্রীদুর্গাস্তুতি আরম্ভ করিলেন—

'অর্জ্জুন উবাচ'

অর্জ্জুন বলিলেন। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব—২৩।৪-১৬)

[১]

"নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি!
কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে।"

"সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি কালি! কাপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! আপনাকে নমস্কার করি॥"

[২]

"ভদ্রকালি! নমস্তুভ্যং মহাকালি! নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তুভ্যং তারিণি! বরবর্ণিনি!"

ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে

নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার ॥

[৩]

"কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে!
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে!"

কাত্যায়নি! মহাভাগে! বিজয়ে! জয়ে! শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! আপনাকে নমস্কার ॥

[৪]

"অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি!
গোপেন্দ্রস্যানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে!"

মহাশূলাস্ত্রে! খড়্গযষ্টিধারিণি! কৃষ্ণানুজে! জগৎপ্রাচীনে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! আপনাকে নমস্কার ॥

[৫]

"মহিষাসৃক্প্রিয়ে! নিত্যং কৌশিকি! পীতবাসিনি!
অট্টহাসে! কাকমুখি! নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে!"

সর্বদা মহিষরক্তপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবসনে! অট্টহাসে! কাকবদনে! রণপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার ॥

[৬]

"উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি!
হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! সুধূম্রাক্ষি! নমোঽস্তু তে।"

উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! পীতনয়নে! বিকৃতনয়নে! অতিধূম্রনয়নে! আপনাকে নমস্কার ॥"

[৭]

"বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ! ব্রহ্মণ্যে ! জাতবেদসি !
জম্বূকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে !

বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ! দেবহিতে ! প্রাচীনজ্ঞাতে ! সর্বদা জম্বূদ্বীপস্থ দুর্গদেবতালয়বাসিনি ! আপনাকে নমস্কার ॥"

[৮]

"ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি ! দুর্গে ! কান্তারবাসিনি !"

কার্ত্তিকেয়জননি ; ভগবতি ! দুর্গে ! মহারণ্যবাসিনি ! আপনি বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা ॥

[৯]

"স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে ॥"

জ্ঞানীরা আপনাকে স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা, গায়ত্রী এবং উপনিষৎ বলিয়া থাকেন ॥

[১০]

"স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি ! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎ প্রসাদাদ্রণাজিরে ॥"

মহাদেবি ! আমি পবিত্র চিত্তে আপনার স্তব করিলাম। সুতরাং আপনার অনুগ্রহে সমরাঙ্গনে সর্বদাই আমার জয় হউক ॥

[১১]

"কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥"

আপনি সর্বদাই ভক্তগণের জন্য মহারণ্যে, ভয়স্থানে, দুর্গমদেশে, ভক্তগণের গৃহে ও পাতালে বাস করেন, আর যুদ্ধে দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন ॥

[১২]

"ত্বং জম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥"

আপনি রতি, মোহিনী, মায়া, লজ্জা, লক্ষ্মী, সন্ধ্যা, দীপ্তি, প্রকৃতি ও জগতের জননী স্বরূপা ॥

[১৩]

"তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্দ্ধিনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥"

দেবী! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্র ও সূর্য্যের উজ্জ্বলতা-কারিণী দীপ্তি এবং সম্পন্নদিগের সম্পৎ; আর যোগিগণ ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে আপনাকেই দেখিয়া থাকেন ॥

অর্জ্জুনের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী—"অন্তরিক্ষগতোবাচ"—আকাশমার্গে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—

"স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।"

—হে পাণ্ডব! অচিরেই তুমি শত্রুগণকে জয় করিবে। এই কথা বলিয়া দেবী সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন—

"ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা তত্রৈবান্তরধীয়ত"।

—০—

তন্ত্রবিজ্ঞান

সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তারাজ্যে দুইটি ধারা বিদ্যমান আছে। বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ধারার ভিত্তি বেদ ও উপনিষদ। তান্ত্রিক ধারার ভিত্তি অগণিত তন্ত্রগ্রন্থ। বৈদিক ধারার পূর্ণতা ভগবদ্‌গীতায়। তান্ত্রিক ধারার চরম পরিণতি সপ্তশতী চণ্ডী।

বেদের অপর নাম নিগম। আর তন্ত্রের অপর নাম আগম। নিগম ও আগম শব্দ দুইটির অর্থ একই। যাহা হইতে সকল জ্ঞান নির্গত হইয়াছে বা আসিয়াছে। উভয়ই নিখিল জ্ঞান-ভাণ্ডার। ঋষির দৃষ্টিতে উভয়ই অপৌরষেয় অর্থাৎ কোন পুরুষের দ্বারা রচিত নহে। ঋষিগণের অনুভব এই যে, সত্য কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না। যাহা কোন সময়ে সৃষ্ট বা দেশ ও কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন তাহা অনিত্য ও অসত্য। যাহা সত্য তাহা চিরকালই বিদ্যমান। তাহার অভাব কখনও হয় না। শ্রীগীতাও একথা বলিয়াছেন ঃ—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।" ২।১৬

অর্থাৎ, অসতের বিদ্যমানতা নেই ও সৎবস্তুর কখনও অভাব হয় না। সত্যের স্রষ্টা নাই, থাকিতে পারে না। সত্যের আছে দ্রষ্টা বা স্মর্তা। সত্যের দর্শন হয়, সত্যের স্মরণ হয়। সত্য সৃষ্ট হয় না কখনও। যেহেতু তন্ত্র ও বেদ উভয়ই সত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেই কারণেই তাহারা অপৌরষেয়। অধিকাংশ তন্ত্রেই বক্তা শিব এবং পার্ব্বতী শ্রোতা। আদি পিতা

বলিতেছেন ও আদি মাতা শ্রবণ করিতেছেন। ইহার দ্বারা অপৌরষেয় তত্ত্বই স্থাপিত হইয়াছে। যাহা অপৌরষেয় তাহার উৎপত্তি সন বা বয়স নির্দ্ধারণের চেষ্টা অর্থহীন। বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বয়স নির্দ্ধারণের প্রভূত চেষ্টা বর্ত্তমানে দৃষ্ট হয়। আর্য্যঋষির দৃষ্টিতে ইহা নিরর্থক। গাছ হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে গাছের জন্ম। গাছ আগে না বীজ আগে এই প্রশ্নের যেমন সমাধান নাই, সত্যের স্রষ্টা কে বা কবে সৃষ্টি হইল তাহারও সেইরূপ সমাধান নাই।

জ্ঞান দ্বিবিধ—দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। জ্ঞানের মধ্যে দু'টি বস্তু আছে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা এবং যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহা জ্ঞেয়। দর্শনের কার্য্য জ্ঞাতার তত্ত্বানুসন্ধান। বিজ্ঞানের কার্য্য জ্ঞেয়বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান। আমি ফুলটি দেখিতেছি। 'আমি কে'—ইহা লইয়া গবেষণা দার্শনিকের কার্য্য। আর ফুলটির উপাদান কি ইহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য।

দর্শন সংশ্লেষাত্মক (synthetic), আর বিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক (analytic)। দর্শনের দৃষ্টি অখণ্ডের দিকে, বিজ্ঞানের দৃষ্টি খণ্ডিত জগতের দিকে। দর্শন দেখে সামগ্রিকভাবে, বিজ্ঞান দেখে খণ্ড খণ্ড ভাবে। সমস্ত বাগানটি একসঙ্গে দেখা দার্শনিক দৃষ্টি আর প্রত্যেকটি গাছ আলাদা করিয়া দেখা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচায়ক।

তান্ত্রিকগণ বৈজ্ঞানিক ভাব ও দৃষ্টিসম্পন্ন। তাহাদের সাধনার ফলে ভারতে বহু গভীর গবেষণাপূর্ণ বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের দান যে কতদূর

উন্নততর ছিল তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "History of Hindu Chemistry" ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্রজেন শীল মহাশয়ের "Positive Science of Hindus" গ্রন্থদ্বয়ে কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। তন্ত্রশব্দের অর্থে ইহাই বুঝায়, যে কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ সুসমঞ্জস তথ্য নিরূপণ (systematic scientific study)। যেমন শল্যতন্ত্র হইতেছে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ব্যবহার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা অর্থাৎ Surgery। দেহের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সুশ্রুত সংহিতার দান পাশ্চাত্য দেশীয় অধুনাতন গ্রে সাহেবের anatomy হইতে কোন অংশে হীন নহে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও তন্ত্রাচার্য্যগণের সূক্ষ্মদেহ বিষয়ক গভীর বিশ্লেষণের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রার প্রভৃতি তত্ত্ব এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্বপ্নের অতীত।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, খ-গোল বা আকাশের জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব বিষয়েও তন্ত্রের বহু অবদান রহিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি প্রভৃতিতে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে দান উহারও মূল তন্ত্রশাস্ত্রই।

পরিবর্ত্তনশীল যাহা তাহাই তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার্য্য। যাহা অপরিবর্ত্তনীয় তাহা বেদবেদান্তের আলোচ্য। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। সুতরাং জাগতিক বস্তুমাত্রই তন্ত্রের আলোচনার বিষয়বস্তু। সাধারণ মানবের নিকট মল, মূত্র থুৎকারাদি ঘৃণার বস্তু। কিন্তু একজন বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসকের নিকট উহাদের মূল্য কম নয়, কারণ উহারা ব্যাধির বিষয়ে

সত্যনিরূপণে সাহায্য করে। লিঙ্গ, যোনি ইত্যাদির আলোচনা সাধারণের কাছে অশ্লীল, কিন্তু তন্ত্রবিজ্ঞানীর নিকট উহা অমূল্য, কারণ উহা সৃষ্টিরহস্যের গভীর তলদেশের সংবাদ দেয়।

দর্শনের আলোচনার বিষয় নিত্য—শাশ্বত বস্তু। ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বস্তু দেশকালের সীমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু এই দেশকালাতীত সত্তা কেমন করিয়া দেশকালের মধ্যে ধরা পড়িল ইহা দার্শনিকের ধ্যানের বিষয়। আর দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধ ও পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মূল রহস্য অনুসন্ধানে তন্ত্রবিজ্ঞানও দার্শনিক অনুধ্যানের নিকটবর্ত্তী। ইহা অত্যুক্তি হইবে না যে বেদান্তদর্শন জগদতীত তত্ত্ববস্তু লইয়া জগতের মধ্যে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করেন। আর তন্ত্রবিজ্ঞান জাগতিক বহু বস্তুর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্ব-লাভ প্রয়াসী। কেবল অখণ্ড বা সামগ্রিক জ্ঞান পূর্ণ নয় আবার কেবল খণ্ডের বা অংশের জ্ঞানই চরম নহে। জ্ঞান তখনই পূর্ণ হয় যখন উহা খণ্ড ও অখণ্ড উভয়প্রকার অনুভূতি দান করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টি ও তন্ত্রের বিশ্লেষক দৃষ্টিভঙ্গী এক পূর্ণ সত্যানুভূতির পক্ষে অপরিহার্য্য। একটি পাখীর দুইটি ডানার মত যেন এক অখণ্ড সত্যের দুইটি দিক। দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক।

তন্ত্রবিজ্ঞানের একটি উদ্দেশ্য তত্ত্ব-সিদ্ধান্তকে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে রূপদান করা। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বহু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া এই প্রয়াস। বহুবিধ অনুষ্ঠানাদির আলোচনায় তন্ত্রশাস্ত্র পূর্ণ। সত্যকে জীবনের মধ্যে আনিতে

হইলেই অনুষ্ঠান চাই। কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরই ইহার সবকিছু নহে। চিত্তের আবেগ, অভীপ্সা, সহৃদয় আকূতি প্রভৃতি ভাবময় বস্তুও অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্তর্লীন। তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানগুলির তাৎপর্য্য কেবল বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। কতকগুলি হৃদয়াবেগ ও গভীর সংকেত ইহার সহিত যুক্ত আছে যাহা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না। ক্রোড়স্থিত শিশুর গণ্ডে স্নেহময়ী জননীর একটি চুম্বনের মাধুর্য্য যেমন মাংশপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের বিশ্লেষণ দ্বারা লাভ করা যায় না, তদ্রূপ ভক্তিপূতচিত্তে ইষ্টদেবের চরণে একটি সচন্দন পুষ্প নিবেদন কেবল উপাচারগুলির বিশ্লেষণে পর্য্যাপ্ত হয় না। তন্ত্রের অনুষ্ঠানগুলি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল হইতে বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকল তন্ত্রের পূজাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া একে অন্যের অভাব পূরণ করিতেছে। কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে যজ্ঞ ও পূজা উভয়ই অপরিহার্য্য। যজ্ঞ বেদের দান, আর পূজা তন্ত্রের। বেদ ও তন্ত্র পরস্পর পরিপূরক।

পাশ্চাত্যদেশে বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিক আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছেন। তাঁহারা সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে একত্র করিয়া ও বিজ্ঞানগুলিকে একত্র করিয়া একটা দার্শনিক দৃষ্টিলাভে প্রয়াসী (unity of the sciences)। কিংবা প্রচলিত দার্শনিক মতবাদকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, কারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞান পাশ্চাত্য-দর্শনকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। অধ্যাত্মদর্শনে—বাইবেলের সিদ্ধান্ত যেমন, ছয় দিনে ভগবান এই বিশ্বরচনা

করিয়াছেন; আদম ও ইভ আদি মানবমানবী ইত্যাদি আধুনিক বিজ্ঞান গ্রহণ করিতে চায় না। কারণ বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে—এই বিশ্বসৃষ্টি হইতে বহু কোটী বর্ষ লাগিয়াছে; ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি অনুসারে (theory of evolution) বানর হইতে মানুষের জন্ম, আদম ও ইভ হইতে নয় ইত্যাদি। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের এই অসামঞ্জস্য পাশ্চাত্য দেশের সংস্কৃতিকে দুর্ব্বল করিতেছে। ইহাদের মিলনের একটা ভিত্তি রচনা চাই-ই চাই। তাহারই প্রয়াসের ফলস্বরূপ বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতা (philosophy of the scientists) প্রভৃতি আন্দোলন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে গড়িয়া উঠিতেছে। স্যর জেমস জিন্‌স্‌ সাহেবের "The Mysterious Universe" ও "The Universe Around Us"; এডিংটন সাহেবের "The Nature of the Physical World" এবং আইন্‌স্‌-টাইন সাহেবের God প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বৈজ্ঞানিকদের দার্শনিকতার ফল বলা যায়। শুধু খণ্ডের আলোচনায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, সকল খণ্ড মিলিয়া কোন অখণ্ডের সংবাদ বহন করিয়া আনে কিনা তাহারই প্রয়াসে এই বৈজ্ঞানিকের দার্শনিকতা।

ভারতীয় তন্ত্রবিজ্ঞান প্রাচীনকালে অনুরূপ কার্য্য করিয়াছে। প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক হইলেও ও বস্তুর বিশ্লেষণে গভীরভাবে নিযুক্ত থাকিলেও সব মিলিয়া একটা একত্বের বা অখণ্ড সত্তার সন্ধান মিলে কিনা তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন তন্ত্রবিজ্ঞান। ফলে তন্ত্রের একটা নিজস্ব দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্ত্র-দর্শন বেদান্ত-দর্শনের পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পরস্পরের

মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। একের মধ্যে অপরে পূর্ণতার সন্ধান পাইয়াছে। ছোটখাট বিরোধ ও বিভেদ ঘটিলেও, উহা জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয় নাই।

বেদান্তের সিদ্ধান্তের নাম ব্রহ্মবাদ্। তন্ত্রের সিদ্ধান্তের নাম শক্তিবাদ। বেদান্তের চরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, তন্ত্রের চরমতত্ত্ব শক্তি। এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও পরিণামে ইহারা পরস্পরের পরিপূরক হইয়া ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছে। বেদ ও তন্ত্রের এবং দর্শন বিজ্ঞানের মিলন জাতির জীবনে মহা গৌরবের দ্যোতক। পাশ্চাত্যদেশে যে বহুবিধ অশান্তি যাহার প্রভাবে প্রাচ্যও আজ বিড়ম্বিত তাহার বাহ্যিক কারণ যাহাই হউক পরমার্থিক কারণ দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মদর্শন দৃঢ়ভাবে ঈশ্বর ও আত্মার তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বরহস্য তন্ন তন্ন করিয়াও জীবাত্মা বা পরমাত্মার কোন সন্ধান পায় নাই। যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বহির্ভূত উহাতে বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রায় পাশ্চাত্য দর্শন আজ ম্রিয়মাণ। কিন্তু ভারতীয় ঋষি বেদ ও তন্ত্রের, দর্শন ও বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব মিলন ঘটাইয়া সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে অমৃতের সন্ধান দেন উহা আজও অমর হইয়া আছে। যুগে যুগে শত সহস্র আঘাত ও বিপর্য্যয় হইতে জাতীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করিয়াছে।

—০—

শক্তিবাদ

বাংলার বিশেষ সম্পদ শক্তির উপাসনা। গৌড়িয়া-বিদ্যা তন্ত্রের আর এক নাম। বর্ত্তমানে তন্ত্রবিষয়ে গবেষণা বা আলোচনা নাই বলিলেই হয়। আত্মভোলা বাঙালীজাতি নিজ সম্পদ সম্বন্ধে যদিও একেবারে উদাসীন, তাহা সত্ত্বেও তন্ত্রের সাধনার ধারা একেবারে মৃত নহে। আমাদের স্মরণ-কালের মধ্যেই রামপ্রসাদ, বামাক্ষেপা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব তন্ত্রধারায় সিদ্ধিলাভ করিয়া এই সাধনাকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

শক্তিবাদ তন্ত্রবিজ্ঞানের বিরাট দান। দার্শনিক দ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতবাদের মত শক্তিবাদ একটা মতবাদ নহে। কারণ ইহা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি তর্ক, বিচার ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ। বৈজ্ঞানিক মতবাদের ভিত্তি পরীক্ষিত সত্য (experimental truth)। অনুভূতি দুই প্রকার—ব্যক্তিগত অনুভূতি ও সার্বজনীন অনুভূতি। কোন বিশেষ ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিতে বিচার, তর্ক ও যুক্তির প্রয়োজন হয়। যাহা সার্বজনীন তাহা ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। স্বতঃ-প্রমাণিত বলিয়া উহা অখণ্ডনীয়। শক্তিবাদ অনুরূপ একটি অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্ত।

শক্তিবাদের প্রথম সিদ্ধান্ত—শক্তি আছে। ইহা সকলের

অনুভববেদ্য। ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বর আছেন ইহা সাধারণের অনুভবের অতীত। যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপন করিতে হয়। তীক্ষ্ণতর যুক্তির দ্বারা আবার উহা খণ্ডিতও হইতে পারে। শক্তিবাদ সেরূপ নহে, ইহা অখণ্ডনীয়। শক্তি নাই বলিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। শক্তি অস্বীকার করিতেও শক্তির প্রয়োজন। শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে বুদ্ধিশক্তি, বিচারশক্তি, বাক্‌শক্তির দ্বারস্থ হইতে হইবে। ভগবান আছেন আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শক্তি আছে ইহাতে আপত্তি করা যায় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শক্তিবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া যে বস্তুর আশ্রয় লইতে হইতেছে তাহাও শক্তি। অতএব উহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য।

শক্তি আছে, ইহা শক্তিবাদের চরম কথা নয়। শক্তিবাদের অন্তরের কথা একমাত্র শক্তিই আছে। নিখিল বিশ্বে শক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। জগতের প্রত্যেক বস্তুই শক্তির সমবায় (conglomeration of energy)। বস্তুমাত্রই শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এক একটি বস্তু শক্তির এক এক ধরণের প্রকাশ। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"—দেবী মহাশক্তি সর্ব্বভূতে শক্তিরূপেই বিরাজিতা—ইহাই তন্ত্রের মহতী ঘোষণা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য বিস্ময়কর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিউটন সাহেবের সময় হইতে তিনশত বর্ষের জয়যাত্রার মধ্য দিয়া আজ বৈজ্ঞানিকেরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন উহা একান্তভাবে তন্ত্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। পরমাণবিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে

একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে বস্তু (matter) সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই যে শক্তির সমবায় উহাতে এখন আর কাহারও সংশয় নাই।

শক্তিবাদের তৃতীয় কথা—সর্ব্বভূতে অর্থাৎ এই নিখিল বিশ্বচরাচরে একটিমাত্র শক্তিই আছে। বহু যে দেখি—তাপ (heat), আলো (light), বৈদ্যুতিক শক্তি (electricity)—উহা দৃষ্টির ভ্রমবশতঃই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া দেখিলে সব একই শক্তির অভিব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান হয়। কিছুদিন পূর্ব্বেও পরমাণু (atom) জগতের মূল কারণ—বিজ্ঞানের এইরূপ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আজ এই মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সকল বস্তুই যে এক শক্তির পরিণতি ইহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। আলো, তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতির মূলে যে একটিমাত্র শক্তি বিদ্যমান—ইহা আজ বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বহুকালের গবেষণার পর পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান আজ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—বিশ্বের মূলে একই শক্তি কাজ করিতেছে, ইহা ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র বহু পূর্ব্বেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকগণ আজ শক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। সেই হেতু তাঁহাদের শাক্ত আখ্যা দেওয়া যায় না। শক্তি মানিলেই শাক্ত হয় না, শক্তির পূজারী হওয়া চাই। ভারতবর্ষে শক্তির যেরূপ পূজা হয়, পাশ্চাত্যদেশে তদ্রূপ হয় না। কারণ, শক্তিবিষয়ে উভয় দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্য

আছে। তন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এবার বৈসাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান কেন শক্তির পূজারী নয়।

বিশ্বের মূল শক্তি এক ও অদ্বিতীয় এ বিষয়ে বিরোধ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই শক্তি জড়া—প্রাণ বা চৈতন্যবিহীন। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, শক্তি কখনও জড়া নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবে চৈতন্যময়ী—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে"——সর্ব্বভূতে চৈতন্যস্বরূপে বিরাজিতা দেবী মহাশক্তিই।

জড়বস্তু আকারে যতই বড় হউক সম্মানের দাবি করে না। সুবৃহৎ হিমালয় পর্ব্বতের উপর হাঁটিয়া যাইতে কাহারও উদ্বেগ হয় না। কিন্তু চেতনসত্বাসম্পন্ন অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও তদ্রূপ উপেক্ষা করা যায় না। চেতনা মর্য্যাদার দাবি রাখে। চৈতন্যময়ী বলিয়া জানিলে পাশ্চাত্যে শক্তিপূজার প্রবর্ত্তন হইতেও পারে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আজ শক্তির কেবল স্বীকৃতিই হয় নাই উহা চৈতন্যের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানী বিশ্বের মূল শক্তিকে মন-সত্বা (mind-stuff)-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। স্যর জেমস্ জিন্স্ সাহেবের মতে বিশ্বের মূল সত্বার মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞান অনুমিত হয়। নচেৎ এই বৈচিত্র্যময় বিরাট সৃষ্টি কখনই এত নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারিত না। তাঁহার মতে এই বিশ্বের কোথাও এতটুকু অঙ্কের ভুল দৃষ্ট হয় না। অঙ্কশাস্ত্রের

জ্ঞান বুদ্ধিও বিচারশক্তির উপর নির্ভর করে। আর বিচার-শক্তি চেতনার উপর নির্ভরশীল। মূলশক্তি অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানসম্পন্ন (mathematical) বলাতে, শক্তির চৈতন্যসত্ত্বা একপ্রকার স্বীকার করাই হইল। ইহা ছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের আরও দুই একটি রহস্যের কথা বলিতেছি।

বর্ত্তমান পদার্থ বিদ্যার (modern physics) একটি নীতি হইতেছে অনির্দ্দেশ্যবাদ (Law of Indeterminacy)। একটা সৌরজগৎ যেরূপ—মধ্যে সূর্য্য চারিপাশে ঘূর্ণায়মান গ্রহগণের অবস্থিতি—সেইরূপ একটি পরমাণুর মধ্যে প্রোটনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রহের ন্যায় ইলেকট্রণগুলি ঘুরিতেছে। সৌরমণ্ডল ও পরমাণুমণ্ডলের পার্থক্য এই যে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকে পরিক্রমা করে। কিন্তু পরমাণুমণ্ডলের মধ্যে ইলেকট্রণগুলি ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের কক্ষ পরিত্যাগ করে। এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে চলিয়া যায়। চলার ভঙ্গি দৌড় নহে, লম্ফন (jump)। লম্ফনের মধ্যে বৈচিত্র্য এই যে, এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময় মাঝখানে কোথাও থাকে না। কখন কোন্ ইলেকট্রণ এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবে এবং কি তাহার গতিবেগ (velocity) তাহা নির্দ্ধারণের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাহার স্থিতিস্থান (position) ও গতিবেগ (velocity)—এই দুইয়ের একই কালে শুদ্ধ নির্দ্ধারণ কিছুতেই সম্ভব নয়। কোন মুহূর্ত্তে ইলেকট্রণের স্থিতি নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইলে, তাহার গতি জানা যায় না। আবার ইলেকট্রণের গতি নিশ্চিতরূপে জানিলে, সেই মুহূর্ত্তে

তাহার স্থিতি নির্ভুলভাবে জানা যায় না। ইহাই হাইসেনবার্গ সাহেবের অনির্দ্দেশ্যবাদ। ইহাতে ইলেকট্রণের স্বাধীনতা অনুমিত হয়।

১৯১৭ সালে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন সাহেব ইউরেনিয়ম, রেডিয়ম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত (spontaneous) বিস্ফোরণ ইত্যাদি হইতে প্রমাণিত করিলেন যে, বিজলিবাতির তারের মধ্যে কোটি কোটি পরমাণুর ইলেকট্রন তেজ ও উত্তাপের তাড়না ও প্রভাব ছাড়াই স্বাধীনভাবে কক্ষত্যাগ করিয়া যায়।

ইলেকট্রণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া এডিংটন প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর আভ্যন্তরিক শক্তির মধ্যে চেতনার অস্তিত্ব অনুমান করেন। কারণ চেতনা ছাড়া স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা সম্ভব নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে উন্নত বিজ্ঞান আজ চেতনার স্বীকৃতির সীমানায় পৌঁছিয়াছে। শক্তি যে চেতনা-সম্পন্ন ইহা আজ বিজ্ঞানের অনুমিতি। পরীক্ষায় নিরীক্ষায় অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে শক্তি যে চেতনাময়ী ইহা তন্ত্রাচার্য্যগণের অনুমিতি নহে, অনুভূতি বটে। গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা পাওয়া সত্য নহে—তপস্যা দ্বারা উপলব্ধ সত্য।

তবে জড়বস্তুর মাধ্যমে চেতনার অনুসন্ধান, চৈতন্যময়ী মহাশক্তির তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন কখনই সম্ভব হইবে না। চেতনার মূর্ত্ত-বিগ্রহস্বরূপিণী শক্তিকে জানিতে হইলে আত্মস্থ হওয়া দরকার। অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে সেইরূপ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হইবে, ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

তন্ত্রের মহাশক্তি এক, অদ্বিতীয়া ও চৈতন্যরূপিণী। ইহাই চরম কথা নহে। চৈতন্যময়ী দেবীর স্বরূপে অসীম করুণা নিহিত আছে। করুণারূপ মহাসম্পদের খবর তাঁহার কৃপাতেই কেবল জানা যায়। বাহ্য আচরণের কাঠিন্যের মধ্যেও মহা-করুণাই লুক্কায়িত আছে—"চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা।" যুদ্ধে অসুর নিধনরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁহার অপরিসীম করুণার পরিমাপ করা যায় না। করুণার স্বরূপ প্রকাশ করাও একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তন্ত্রবিজ্ঞান বলিয়াছেন—ইনি মাতৃরূপা। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বত্র এই মাতৃত্ব বিদ্যমান।—"যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"। বিশ্বের সকল মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-করুণা একত্র করিলেও দেবী মহামায়ার মাতৃত্বের সমতুল হয় না।

সৌরজগতের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের সূর্য্য হইতে বৃহত্তর এক সূর্য্য কোন্ অজানা কারণে ইহার নিকট দিয়া বেগে চলিয়া যায়। সেই বৃহত্তর সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণে আমাদের সূর্য্যের অঙ্গহানি ঘটে। নয়টি অংশ ছুটিয়া বাহির হয় ইহার দেহ হইতে। কিন্তু এই অংশ বা গ্রহগুলি একেবারে হারাইয়া যায় নাই। সূর্য্য হইতে বাহির হইয়া এক একটি নির্দ্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া সূর্য্যকেই পরিক্রমা করিতেছে। সূর্য্য যেমন গ্রহগুলিকে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, হারাইয়া যাইতে দেয় নাই, এই বিশ্বও মহামায়া হইতে আসিয়া তাঁহারই ক্রোড়ে স্থিত আছে। আমরা না বুঝিলেও মাতৃবৎ করুণা যে আমাদের ধরিয়া রাখিয়াছে ও

ধ্বংস হইতে দেয় নাই, ইহা তন্ত্রের কল্যাণ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ করুণা দেখা যায় না। হৃদয়বৃত্তির সম্প্রসারণেই অনুভব হয়। পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানের মাথা আছে, হৃদয় নাই। তন্ত্রবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের সহিত হৃদয়াবেগ যুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু জড়-বিজ্ঞান যাহা দেখিতে অসমর্থ, তাহা তন্ত্র-বিজ্ঞান দেখিতে পাইয়াছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে শক্তি জড়, তাই উহাকে সংহত বা অধীন (control) করিয়া মানবের সুখসুবিধার্থে নিয়োগ করা বৈজ্ঞানিকের চেষ্টা। পক্ষান্তরে তন্ত্রবিজ্ঞান শক্তির চৈতন্যস্বরূপ বিশ্বাসী বলিয়া শক্তিকে অধীন করিয়া নিজ সুখবিধানার্থে প্রয়োগের পক্ষপাতী নহে। চেতনাবস্তু অধীন হইতে চাহে না বা অধীন (control) করিতে চেষ্টা করিলে ফল ভাল হয় না। একটি বালকও যদি বুঝিতে পারে যে তাহাকে অধীন করিয়া যথেচ্ছা চালিত করিবার কেহ চেষ্টা করিতেছে, সে তখন আর উহা অম্লান বদনে মানিয়া লয় না। তন্ত্রমতে বিশ্বের মূল যে শক্তি, যাহা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, তাঁহাকে অধীন করিয়া ভোগ করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সেই শক্তিরূপা দেবীকে জানিয়া, তাঁহার অনুগত হইয়া পূজা করিলে, তাঁহার কৃপাতেই বিশ্বের সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

চণ্ডীগ্রন্থে উক্ত আছে, রূপলাবণ্যবতী মাতৃদেবী মহাশক্তির কথা শুনিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ তাঁহাকে বিবাহ অর্থাৎ ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শক্তি ভোগের বস্তু

নহে। তিনি মাতৃরূপা ও বিশ্বের সকল দেব ও মানবের পূজ্যা। মায়ের আরাধনাতেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির দ্বারা সাধক পরমা শান্তির অধিকারী হন। পক্ষান্তরে সমাজ-দুর্নীতিপরায়ণ হইলে ও শক্তিরূপিণী মাকে ভোগ করিতে চেষ্টা করিলে ফল শুভ হয় না। তন্ত্রমতে ইহা আসুরিক প্রয়াস। রাবণ দেবশক্তিকে জয় করিয়া নিজ সুখভোগে নিয়োজিত করে। ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, বরুণ রাবণের আজ্ঞাবাহী দাসের মত সেবা করিত। কিন্তু আড়ালে তাঁহারা রাবণের বিনাশের জন্য সদাই চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অভিলাষ পূরণ করেন। মানব-সভ্যতা যখন কেবল ভোগ উপকরণ সমৃদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়-ভোগসুখপরায়ণ হইয়া উঠে এবং আধ্যাত্মিক নীতি ও মানবতার শ্রেষ্ঠ অবদান সকল পদদলিত করিয়া চলে, তখন সেই আসুরিক সভ্যতা যে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইতেছে, ইহাতে আর সংশয় থাকে না।

পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার ধ্বংসের রূপ দেখিয়া ও মানবের ধ্বংসমূলক কার্য্যে উহার নিয়োগ ও প্রস্তুতির প্রয়াস সারা বিশ্বে আজ ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে। নৈতিক জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সমুন্নত ও মানবের কল্যাণকামী কোন বিশ্বমানব সংস্থার (world board) উপর এই পারমাণবিক শক্তির পরিচালনার ভার ন্যস্ত না হইলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। তন্ত্রবিজ্ঞানের এই অভিমত।

মহাশক্তির সহিত যুক্ত হইলেই সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। যুক্ততা নষ্ট হইলে দুঃখ ও অশান্তি।

জীবনে দুঃখ আসিলে বুঝিতে হইবে ব্যক্তি-জীবন মায়ের নিকট হইতে বিযুক্ত অর্থাৎ শক্তিহীন হইয়াছে। তন্ত্রমতে মহাশক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপনের উপায় পূজা। পূজার তত্ত্ব পরে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

দেবীসূক্ত

বৈদিক ও তান্ত্রিক দ্বিবিধা চিন্তাপ্রবাহের কথা প্রারম্ভেই বলিয়াছি। এই দুইটি ধারার মিলন সূত্র হইল দেবীসূক্ত। শ্রীচণ্ডী পাঠের প্রথমেই দেবীসূক্ত পাঠের বিধি। এই সূক্তটি ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্ত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য এই সূক্তটি জপ করিয়া মহাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন।

স চ বৈশ্য স্তপ স্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্। চণ্ডী ১৩।১০

এই বৈদিক মন্ত্রটির জপদ্বারা তন্ত্র-প্রতিপাদ্য মহাশক্তির অর্চ্চনা ও সাক্ষাৎকার হইল। এইজন্য এই মন্ত্রকে দুইটি ধারার মিলনী সূত্র বলা হইয়াছে।

যাহা সুষ্ঠুভাবে উক্ত তাহাকে সূক্ত বলা হয়। বৈদিক মন্ত্রকে সূক্ত বলা হয়। এই মন্ত্রের দ্রষ্ট্রী ঋষি একজন নারী। তিনি অম্ভৃণ নামক ঋষির কন্যা। তাঁহার নাম বাক্‌দেবী। তাঁহার নামানুসারে এই সূক্তটিকে বাক্‌সূক্তও বলা হয়।

এই মন্ত্রের অর্থবোধ হইলে অনুভব হইবে যে, তন্ত্র শাস্ত্রে যে মহাশক্তির কথা বলা হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ঋষি-কন্যাকে যন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার মাধ্যমে স্বকীয় পরম স্বরূপ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। দেবী-মাহাত্ম্য চণ্ডী গ্রন্থে প্রবেশ করিবার জন্য এই সূক্ত তোরণস্বরূপ। যে সকল তত্ত্ব চণ্ডী গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় তৎসমুদয় বীজাকারে এই দেবীসূক্তে বিরাজমান।

বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলেন যে, এই দেবীসূক্তে বাক-দেবী নিজে পরমাত্মার সহিত তাঁহার একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন এবং সেই আত্মার আত্মা পরমাত্মার স্তুতি করিতেছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মার স্তুতিতে তন্ত্র-প্রতিপাদ্য পরাশক্তি স্তুত হইয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট ভাবেই বোঝা গেল যে, পরমাত্মা ও পরাশক্তি অভিন্ন বস্তুই। দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা যে একই মহাসত্যের পরিচয়, ইহা দেবী-সূক্ত প্রতিপন্ন করিতেছে।

দেবী-সূক্তে আটটি মন্ত্র আছে। প্রথম মন্ত্রটি এই,—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহং আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহং ইন্দ্রাগ্নি অহমশ্বিনোভা॥ ১ ॥

আমি রুদ্র ও বসুরূপে বিচরণ করি। আমি আদিত্য ও বিশ্বদেব-রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

এই মন্ত্রে রুদ্র ও বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেব, ইন্দ্র ও অগ্নি, অশ্বিনীকুমারযুগল এই অষ্ট বৈদিক দেবতার কথা বলা আছে।

রুদ্র একত্বাভিমুখী শক্তি—বসু বহুত্বাভিমুখী শক্তি। আমি রুদ্র, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আমি একত্বের দিকে লইয়া যাই সকল বহুত্বের বিলোপ সাধন করিয়া। আমি বসু, বহুত্ব প্রকাশক শক্তিরূপে আমি নানা বিচিত্রতাপূর্ণ জগৎ ব্যক্ত করি।

আদিত্য একত্বের ধারক, বিশ্বদেব বহুত্বের ধারক। ব্যক্ত-বহুত্বকে আমি আদিত্যরূপে একক স্বরূপে ধারণ করি। আমি বিশ্বদেব, বহু হইয়াও প্রত্যেকটি বস্তুতে পূর্ণরূপে বিরাজ করি।

মিত্র ও বরুণ নীতি ও শৃঙ্খলার দেবতা। মিত্র বহির্জগতের শৃঙ্খলাকারী, বরুণ অন্তর্জগতের শৃঙ্খলাকারক। আমি মিত্র ও বরুণরূপে বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের শৃঙ্খলা সাধন করি। জড় ও চিৎ জগৎ আমার শক্তিতেই সুনিয়ন্ত্রিত আছে।

যে শক্তি বিরাজিত বা স্থিত আছে তাহা ইন্দ্র। যে শক্তি গতিমান হইয়া কার্য্যসাধন করে তাহা অগ্নি। আমি স্থিতিমান ও গতিমান (static & dynamic) উভয়বিধ শক্তিরূপে বিদ্যমান। অশ্বিনীকুমারদ্বয় সূর্য্যমার্গ ও চন্দ্রমার্গের বিধানকর্ত্তা। তাঁহারা দিবা ও রাত্রস্বরূপ, ঈড়া ও পিঙ্গলাস্বরূপ। জগতের আলো অন্ধকার, সুখদুঃখ, শুভাশুভ আমার শক্তিতেই বিধৃত।

চণ্ডীতে দেবীও বলিয়াছেন, "অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদা স্থিতা (১০।৮)। অর্থাৎ আমি ঐশ্বর্য্য দ্বারা বহু মূর্ত্তিতে অবস্থান করি। এই তত্ত্ব গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগে

বিশেষভাবেই কথিত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুন এক স্থানে সকল দেবতার দর্শন করিয়াছেন। একই মহাশক্তি বহু দেবশক্তিরূপে জগতে ক্রিয়াশীলা। দেবীসূক্তের প্রথম মন্ত্র এই সংবাদই বহন করিতেছে। দ্বিতীয় মন্ত্র এই—

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্মি
অহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥

আমি শত্রুনাশক সোমকে ধরিয়া আছি, আমি ত্বষ্টা, পূষা ও ভর্গদেবকে ধারণ করি। যে যজমানের প্রচুর হবি আছে ও তাহা তিনি দেবোদ্দেশে অর্পণ করেন ও বিধিমত সোমাভিষেক করেন, তাহাকে যজ্ঞের ফল দান করি।

জীব ও জগতের মধ্যে নিরন্তর একটী ক্ষয় লাগিয়া আছে। এই ক্ষয়রূপ শত্রু হইতে রক্ষা করিয়া যে শক্তি সর্ব্বদা পুষ্টি বিধান করেন তিনি সোম। চিজ্জগতের পোষণকারী সোম, জড়জগতের পোষক পূষা। প্রত্যেক ছোট বড় বস্তুকে যিনি তৎ তৎ রূপ দান করেন তিনি ত্বষ্টা, তিনি বিশ্বকর্ম্মা। ভর্গদেব জ্যোতিঃস্বরূপ। ইনি সাধককে সাধনার যোগ্যফল প্রদান করেন।

এই সংসারে কাহারও হয়ত সম্পদ আছে, দাতৃত্ব নাই। কাহারও বা দানশীল স্বভাব কিন্তু তিনি দরিদ্র। যাহার আছেও প্রচুর এবং জগৎ কল্যাণে দানও করেন প্রচুর তাঁহারই সার্থকজন্ম। সেইরূপ, যে যজমান যিনি নিত্য বিধিমত ওজঃশক্তি সাধনা

করেন তাহাকে আমি তাহার প্রয়োজন অনুরূপ সম্পদ দান করি। যজমান যদি ভোগার্থী হয় তাহাকে ভোগ দেই। যদি স্বর্গার্থী হয় স্বর্গ দেই, যদি মোক্ষার্থী হয় তবে মোক্ষই প্রদান করিয়া থাকি। চণ্ডী গ্রন্থেও বলা হইয়াছে—

আরাধিতা সৈব নৃণ্যং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ ১৩।৫

এই দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হইল যে, সেই মহাশক্তি কল্যাণময়ী মাতার মত সন্তানকে ক্ষয় হইতে রক্ষা করিয়া পোষণ করেন। সকল বস্তুকে রূপদান করেন ও যোগ্য সাধককে যথাযোগ্য ফল দান করেন। এক তিনি বহু রূপ ধরিয়া বিভিন্ন প্রকারে নিজেকেই নিজে পোষণ করেন।

অতঃপর তৃতীয় মন্ত্র বলা যাইতেছে—

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভুরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥

আমি রাষ্ট্রী, রাষ্ট্রের অধিশ্বরী। রাজ্য রক্ষার্থ যে সম্পদের প্রয়োজন, আমি তাহার বিধানকর্ত্তা। সংসারে শান্তিলাভের জন্য যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজন, আমি তাহাই (চিকিতুষী)। আমি এক হইয়াও বহুরূপিণী। সর্ব্বজীবে আমি বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আছি। দৈবী সম্পদশালী দেবতাগণ যাহা সাধন করেন সকলই আমার উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হয়।

আকাশাৎ পতিতং তোয়ঃ যথা গচ্ছতি সাগরং।

আকাশ হইতে পতিত বর্ষাধারা যেমন শেষ পর্য্যন্ত সকলই

সাগরে গমন করে, সেইরূপ সকল দেবতার অর্চ্চনাই এক পরম দেবতায় পর্য্যবসান হয়। গীতাতেও ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত যে দেবতার অর্চ্চনাই করুক আমারই পূজা হয়। তবে সকলই একই পরমস্বরূপের প্রকাশ, ইহা জানিলে অর্চ্চনা যথাবিধি হয়,—না জানিলে অবিধিপূর্ব্বক হয়।

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইল যে, একই মহাশক্তি রাষ্ট্রশক্তিরূপে, ধনদাত্রীরূপে ও ব্রহ্মজ্ঞানরূপে বিরাজমানা। বহুরূপে তিনি প্রকাশমানা। এই তত্ত্ব জানিয়া যেখানেই মস্তক অবনত করি, তাঁহার সমীপেই পৌঁছিয়া যায়। চতুর্থ মন্ত্র—

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥৪॥

যে অন্নাহার করে, যে দর্শন করে, যে প্রাণধারণ করে, যে বাক্য শ্রবণ করে সেই ব্যক্তি আমাদ্বারাই ঐ সকল কর্ম্ম সমাধা করিয়া থাকে। আমার ঈদৃশ স্বরূপতত্ত্ব যাহারা জানে না তাহারা হীনদশা প্রাপ্ত হয়। শোন হে যশস্বী বন্ধু! বহু সাধনালব্ধ যে বার্ত্তা তাহা তোমাকে বলিব।

মনুষ্যদেহে যে সকল ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার তাহা সকলই এক মহাশক্তির কার্য্য। দেখাশুনা, আহার, প্রাণরক্ষা যাবতীয় কার্য্যই একটি মহাশক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। চণ্ডীতেও বলা হইয়াছে তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি (ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ৫।৭৭)।

দেহেন্দ্রিয়ের সকল শক্তির মূলাধাররূপে তাঁহাকে যাহারা জানে না তাহারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা জানেন তাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা থাকিলে এই তত্ত্ব জানা যায়। এই জ্ঞাতব্য তত্ত্ব বলা হইতেছে, নিবিষ্টভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইল যে, কেবল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় কার্য্যই যে তিনি করিতেছেন তাহা নহে; তোমার আমার ক্ষুদ্র এই দেহভাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার সেই একই মহাশক্তি দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চালক ও আমার ক্ষুদ্র দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক যে একই মহাশক্তি, ইহা যিনি জানেন না তিনি দিনের পর দিন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হন। সুতরাং ইহা জানাই কর্ত্তব্য।

পঞ্চম মন্ত্র—

অহমেব স্বযমিদং বদামি জুষ্টং
দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥৫॥

আমিই নিজে সেই কথা বলিতেছি, যাহা দেবগণ ও মনুষ্যগণ সকলে জানিবার জন্য যত্নপরায়ণ। যে যেমন কামনা করে তা'কে তেমনটি আমিই করিয়া থাকি। ব্রহ্মাও আমি করি, ঋষিও আমি করি, জ্ঞানীও আমারই সৃষ্টি।

যে জ্ঞান লাভ না হইলে শান্তি লাভের উপায় নাই সেই জ্ঞান লাভের জন্য দেবতা ও মনুষ্য সকলেই সর্ব্বদা চেষ্টারত।

জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সকলেই ব্রহ্মানুসন্ধান করে। সাধনফলে তাহারা আমাকে জানে। জানিয়া আমার কথা বলে। আজ আমার স্বরূপকথা আমি নিজেই বলিতেছি। ইহা আমার সাধনালব্ধ কথা নয়—আমার নিজস্ব স্বরূপ-কথা। সুতরাং মনঃসংযোগ সহকারে শ্রবণ করা উচিত।

যে যেরূপ কামনা করে, সে সেরূপ ফল লাভ করে। কামনা বলিতে শুধু ইচ্ছা নহে, ইচ্ছার সহিত প্রযত্ন বুঝাইবে। wish নহে, will. যে যাহা পাইবার জন্য সাধনশীল, সে যে তাহা পায় —ইহা কেবল সাধনার ফল নয়—আমি কৃপা করিয়া দেই বলিয়া পায়।....চেষ্টা করিবার ইচ্ছা ও শক্তিও আমি দেই, আবার ফলও আমি দেই। সুতরাং আমিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহাকে যাহা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে তাহা করি। ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, ঋষির ঋষিত্ব, মেধাবীর মেধা সকলই আমার মহতী ইচ্ছার ফল।

পঞ্চম মন্ত্রে বলিলেন, জীবের যাহা কিছু লভ্য সকলই মহা-শক্তির প্রসাদে হইয়া থাকে। চণ্ডীতেও উক্ত হইয়াছে— "সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না" (৪।১৫)। মা প্রসন্না হইলে সকল প্রকার অভ্যুদয় দান করেন। সেই মহাশক্তির কাছে আত্ম-নিবেদনেই জীবের কল্যাণ। তাঁহার মহতী ইচ্ছার সঙ্গে ক্ষুদ্র ইচ্ছা মিলাইয়া দেওয়াই মানুষের কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ মন্ত্র—

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।

অহং জনায় সমদং কৃণোমি
অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ।। ৬ ।।

আমি রুদ্রের ধনুকে জ্যাযুক্ত করিয়া বিস্তার করি, যাহারা ব্রহ্মদ্বেষী তাহাদের নাশের জন্য। সজ্জনের রক্ষার্থ আমি যুদ্ধ করি। স্বর্গে মর্ত্ত্যে সর্ব্বত্র আমি সংপ্রবিষ্ট হইয়া আছি।

যাহারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করে তাহাদের পথের যাবতীয় বাধা আমি দূর করিয়া দেই। লয়কারী রুদ্রের ধনুকে তীর আরোপ করিয়া আমি সাধকের সাধনপথের অশেষ অনর্থ অপনোদন করি। যাহারা সাধক তাহাদের কল্যাণ করাই আমার ব্রত। এই মহাকল্যাণ শক্তিরূপে—আমি বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান আছি।

ষষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইল যে, মহামঙ্গলদায়িনী শক্তিরূপে তিনি সর্ব্বত্র আছেন। ভক্ত তাঁহার দিকে যাত্রা করিলে পথের বাধা তিনি সকল দূর করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন। সুর-বিরোধী আসুরিক শক্তি দমনে তিনি সর্ব্বদাই রত।

সপ্তম মন্ত্র—

অহং সুবে পিতারমস্য মূর্দ্ধন্
মম যোনিরপ্ স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা
উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

সর্ব্বোপরি যে জগতের পিতা তাহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি। পরম জ্ঞান-সমুদ্রের অন্তস্তলে আমার যোনিস্থান।

সর্ব্বভুবনে আমি অনুপ্রবিষ্ট। ভূলোকের ঊর্দ্ধে যে দ্যুলোক আছে, তাহাও স্থির আছে আমি স্পর্শ করিয়া আছি বলিয়া।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাধানিক রহস্য প্রকরণে উক্ত আছে—মহালক্ষ্মী হইতে ব্রহ্মা ও শ্রী, মহাকালী হইতে রুদ্র ও ত্রয়ী এবং মহাসরস্বতী হইতে বিষ্ণু ও গৌরী উৎপন্ন হইয়াছেন। পরে মহাশক্তি ব্রহ্মাকে ত্রয়ী, রুদ্রকে গৌরী ও বিষ্ণুকে শ্রী পত্নীরূপে অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মী নৃপ ত্রয়ীং
রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্॥

এই সিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবও মহাশক্তি হইতে উৎপন্ন। তাই দেবীসূক্ত বলিতেছেন—জগতের যে পিতা তাহাকেও আমি প্রসব করিয়াছি।

মায়ের যেটি জননস্থান মূল গৌরীপীঠ, সেটি কোথায় তাই বলিতেছেন, "অপস্থ অন্তঃ সমুদ্রে", জ্ঞান-সমুদ্রের গভীরে গূঢ়ভাবে নিহিত। উপনিষদ তাহাকে গূঢ়ত্মা বলিয়াছেন। সেই গূঢ়বস্তুকে স্থূলবুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না। কঠোপনিষদের মন্ত্রে আছে—

দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শীভিঃ॥ ৩।১২॥

সূক্ষ্মদর্শী অতি তীক্ষ্ণ সূক্ষ্মবুদ্ধির সাহায্যে তাঁহাকে জানিতে পারেন। সেই গূঢ় যোনিস্থান হইতে অনন্ত বিশ্ব উদ্ভূত। মা যে কেবল প্রসব করিয়াছেন তাহা নহে। প্রসূত সকল বস্তুতে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রুতি মন্ত্রে আছে—

"তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ"

ভূলোক হইল স্থূল জগৎ, দ্যুলোক হইল সূক্ষ্মজগৎ; এই দুই স্থিত আছে, কারণরূপিণী মহাশক্তি তাঁহার দেহ দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়া, তিনি ছুঁইয়া আছেন বলিয়াই নিখিল বিশ্ব ক্রিয়াশীল।

সপ্তম মন্ত্রে বলা হইল যে, মহাশক্তি সকল কারণের কারণ-স্বরূপিণী। তাঁহার কৃপাস্পর্শে নিখিল বিশ্ব জীবন্ত। মাতৃ অঙ্কে জগৎ সংসার বিধৃত।

অষ্টম মন্ত্র—

অহমেব বাত ইব প্রবামি
আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা
এতাবতী মহিনা সং বভুব ॥ ৮ ॥

ভুলোক ভুবর্লোকাদি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিতে করিতে আমি তাহার উপর বায়ুর মত প্রবাহিত হই। মূলতঃ আমি ভুলোক দ্যুলোক সকলের ঊর্দ্ধে। আমি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাতীত, তথাপি নিজ মহিমায় জগন্ময় এই বিশ্বরূপধারিণী হইয়া আছি।

তিনি বিশ্বাতিগ হইয়াও বিশ্বগ। একই কালে Trans-cendent ও Immanent জগদতীত হইয়াও জগদ্রূপে সম্ভূত। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" আবার "ন চ মৎস্থানি ভূতানি।" কাহারও সঙ্গে তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই—তবু সকল সৃষ্টি করিয়া সকলের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। দেবীসূক্তের

অষ্টম মন্ত্রের ইহাই বার্ত্তা। সমগ্র দেবীসূক্ত এই সংবাদ দিল যে, উপনিষদের পরাৎপর ব্রহ্ম ও তন্ত্রশাস্ত্রের মহাশক্তি একই বস্তু।

রাত্রিসূক্ত

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশত সাতইশ সংখ্যক সূক্তটির নাম রাত্রিসূক্ত। এই সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি-ভরদ্বাজ কন্যা রাত্রি। (কাহারও মতে সৌভরি-মুনির পুত্র কুশিক)। এই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাত্রিদেবী। ইঁহার ছন্দ হইতেছে গায়ত্রী। এই সূক্তে আটটি মন্ত্র আছে। দুর্গাদেবীর প্রীত্যর্থে চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে এই সূক্ত পাঠের বিধি আছে। রাত্রি একটি দেবী। বিশ্ব-জননীর ইনি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি। ইঁহার মহিমা বর্ণন করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন।

১। বহুস্থানে বহুদেশে (পুরুত্রা) দীপ্তিশালিনী (দেবী) রাত্রিদেবী আসিতে আসিতে (আয়তী) নক্ষত্ররূপ চক্ষুগুলি খুলিয়া (অক্ষভিঃ) আমাদিগকে বিশেষ ভাবে দর্শন করিতেছেন (ব্যখ্যৎ)। ইনি অশেষ প্রকার শোভা (শ্রিয়ঃ) ধারণ করিয়াছেন (অধিত)।

২। মরণধর্ম্মরহিতা (অমর্ত্ত্যা) অমৃতময়ী রাত্রিদেবীর খেলা দেখ। ইনি প্রথমে বিস্তীর্ণ (উরু) গগনমণ্ডলকে অন্ধকার দ্বারা (তমসা) পরিপূর্ণ করেন (আপ্রাঃ) তারপর নীচের (নিবতং) তৃণগুল্মগুলিকে, তারপর উচ্চে উত্থিত (উদবতঃ) বৃক্ষাদিকে

নিজের অন্ধকাররূপ শক্তিদ্বারা আবরণ করেন। তারপর আবার চন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্রগণের (জ্যোতিষ্ক) কিরণ দ্বারা সেই অন্ধকারকে (তমঃ) পীড়ন করেন (বাধতে)।

অন্ধকার দিয়া তিনিই বিশ্ব ছাইয়া ফেলেন আবার উহা দূর করিবার উপায়ও তিনিই করেন।

৩। ক্রীড়াময়ী রাত্রিদেবী যাইবার সময় ভগ্নী (স্বসারম্) উষাদেবীকে সম্পাদন করেন (অস্কৃত), তারপর ভগ্নী আসিয়া রাত্রির অন্ধকার দূর করিয়া দেন।

যিনি অন্ধকার করেন তিনিই আলোর সৃষ্টি করেন। আঁধার-রূপে ঢাকেন। আলোরূপে খুলেন। রাত্রিদেবী ও উষাদেবী দুই বোন।

৪। অন্ধকার যে কেবল দুঃখদায়ক তাহা নহে—রাত্রিদেবী উপস্থিত হইলে পক্ষীরা বৃক্ষস্থিত বাসায় যেরূপ সুখে থাকে, আমরাও গৃহে সেইরূপ সুখে থাকি। রাত্রিদেবতা প্রসন্না হইলেই জীবন সুখময় হয়। হে দেবী প্রসন্না হউন।

৫। রাত্রিদেবী আসিলে গ্রামবাসী ও নরনারী (গ্রামাসঃ) গো-মহিষাদি পশুগণ (পদবন্তঃ) পক্ষীগণ এবং বেগশালী (অর্থিনঃ) শ্যেন পাখীরা সকলেই শয়ন-সুখ ভোগ করে (অবিক্ষত)।

দেবীর কাহারও উপর পক্ষপাতিত্ব নাই। সকলকেই সুখ দেন। সকলকেই দেখেন।

৬। হে রাত্রিদেবী, (উর্ম্যে) বৃক ও বৃকীর হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। দম্ভ, মোহ, মদ, লোভ এরা হইল বৃক, আর ঈর্ষা, হিংসা, অসূয়া, নির্দ্দয়তা এরা হইল বৃকী। ইহাদের

৩

হস্ত হইতে আমাদের বাঁচাও। আর চোরকে দূর কর। কাম ক্রোধ বিষয়ানুরাগ এরা হইল তস্কর। ইহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে দূরে রাখ। এই ভাবে আমাদের সুখের কারণ (সুতরা) হও।

রাত্রির নিদ্রার একদিক যেমন শান্তি, অপর দিক তেমন সকল ভুলিয়া যাওয়ারূপ অজ্ঞানতা। শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া অজ্ঞানান্ধকার দূর হবার জন্য ঊষাদেবীকে বলিতেছেন—

৭। হে ঊষাদেবী, ঐ দেখ সকল বস্তুতে সংলগ্ন (পেপিশৎ) কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে (ব্যক্তমস্থিত) ঋণের ন্যায় তুমি তাহাকে দূর করিয়া দেও (ঋণেব যাতয়)।

ঋণ যেমন পীড়াদায়ক, শোধ হইলেই শান্তি, অজ্ঞানান্ধকারও সেইরূপ বেদানাদায়ক, দূর হইলেই শান্তি।

৮। আবার রাত্রিদেবীকে বলিতেছেন—হে সূর্য্যকন্যা (দুহিতুর্দিবঃ), হে পরমাত্মার শান্তিরূপী দুহিতা, আমরা তোমার স্তব করিতেছি। গাভী দোহনকারী ব্যক্তি যে প্রকার গাত্র কণ্ডুয়নাদি দ্বারা গাভীকে দোহনাভিমুখী করে, সেইরূপ আমরা স্তব স্তুতি দ্বারা তোমাকে আমাদের অভিমুখী করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমরা শত্রুজয় করিতে ইচ্ছুক (জিগ্যুষে)। আমাদের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কল্যাণের পক্ষে যাহা বাধা তাহাকে আমরা জয় করিতে অভিলাষী। তুমি আমাদের স্তব গ্রহণ কর। অগ্নিতে হবি দিলে সে যেমন তাহা গ্রহণ করে (হবিরিব-সায়ন), সেইরূপ স্তব গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হও (বৃণীষ্ব)।

রাত্রি আমাদের শ্রান্তি দূর করিয়া শান্তি আনে আবার মোহগ্রস্ত করিয়া কামাদি রিপুর বশীভূত করে। রাত্রিদেবীর এই দুই বিরুদ্ধ স্বরূপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সূক্তটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের একটি গানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই পদের ভাব লইয়া সূক্ত আস্বাদনীয়।

"শ্রান্তি নিবারিণী নিদ্রে কেন শ্রান্তি কর দূর।
প্রবেশিয়ে জীব হৃদে কেন হান মোহশর।
কেন ওলো মনোরমে
বিভাবরী সমাগমে
শ্রান্ত মানবের তরে অবারিত তব ক্রোড়।
কহ ওলো নিশি সখী
স্বরূপ কহলো মোরে
কে তোমারে প্রদানিল এহেন মোহন বর।"

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু

(সংকীর্ত্তন পদামৃত ১২৪ পৃষ্ঠা)

———

মহামায়া কে ?

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে সুরথ রাজা মেধস ঋষির নিকট প্রশ্ন তুলিয়াছেন—

"ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপ যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তো ব্রহ্মবিদাং বর ॥" ১।৬০-৬২

অর্থাৎ ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্না হইয়াছেন? তাঁহার কর্ম্মই বা কি? তাঁহার যেরূপ স্বভাব, যেরূপ স্বরূপ, যেরূপ উৎপত্তি, হে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট হইতে সেই সমস্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

প্রথম প্রশ্ন বস্তুবিষয়ক—তিনি কে? দ্বিতীয় প্রশ্ন উৎপত্তি প্রকরণের—কি প্রকারে তিনি উৎপন্না হন? তৃতীয় প্রশ্ন কর্ম্মবিষয়ে—তাঁহার কার্য্য কি? চতুর্থ প্রশ্ন নিত্যানিত্যত্ব বিষয়ে—কি তাঁহার স্বভাব? পঞ্চম প্রশ্ন শ্রীমূর্তি বিষয়ে—কি তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ আকৃতি? ষষ্ঠ প্রশ্ন পিত্রাদির সম্বন্ধে—কোথা হইতে উৎপত্তি?

ঋষি প্রথমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। "নিত্যৈব সা" অর্থাৎ তিনি নিত্যা। নিত্যা বলিয়াই উৎপত্তিরহিতা। ইহা দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। নিত্যা বলিয়াই

অনিত্যত্বস্পর্শরহিতা। ইহাতে চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে। কিরূপে উৎপন্না ও স্বভাব কিরূপ এক কথায় ইহাদের উত্তর দিয়া ঋষি মহাদেবীর স্বরূপ বা আকৃতি বিষয়ে পঞ্চম প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"জগন্মূর্ত্তিঃ" অর্থাৎ এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি।

তাঁহার ক্রিয়াবিষয়ে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"তয়া সর্ব্বমিদং ততম্" অর্থাৎ তাহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ বিস্তারিত অর্থাৎ উৎপাদিত হইয়াছে। জগদ্বিস্তারই তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার উৎপত্তির কথা ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, তাঁহার জন্মাদি নাই তথাপি দেবতাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন তখন তাঁহাকে সকলে উৎপন্না বলেন, যথা—

"দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥" ১।৬৫

প্রথম প্রশ্ন ব্যতীত আর সকল প্রশ্নের উত্তর হইল। প্রথম প্রশ্নের উত্তর সমগ্র গ্রন্থমধ্যে ছড়াইয়া আছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে।

"তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।"১।৫৪।৫৫

মহামায়া দেবী ভগবতী। ইনি জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা। তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন। তিনি জ্ঞানীগণের চিত্তও মুগ্ধ করেন। বস্তুতত্ত্বের তিনটি পরিচয় পাওয়া গেল। ১ম, শ্রীহরির যোগনিদ্রা—হরিকেও নিদ্রায় অভিভূত করেন, মোহিত করেন। ২য়, জগৎকে মুগ্ধ করেন। ৩য়, জ্ঞানীদেরও

মোহিত করেন। প্রথমটি যোগনিদ্রা, দ্বিতীয়টি অবিদ্যা ও তৃতীয়টি বিদ্যা।

যোগনিদ্রার অপর নাম আত্মমায়া বা যোগমায়া। এই মহাশক্তি অবলম্বনে শ্রীহরি আবির্ভূত হন—"সম্ভবাম্যাত্মমায়া" (গীতা ৪-৬)। ইহা দ্বারা নিজে আবৃত হন। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ" (গীতা ৭-২৫) তিনি যোগমায়া সমাবৃত বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে না। এই মহামায়া মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তৎকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছিলেন—

"ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং।
যদূনাং নিজনাথাং যোগমায়াং সমাদিশৎ॥
গচ্ছ দেবী ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলংকৃতং॥"

শ্রীভগবান যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পরমভক্ত যাদবগণ কংস কর্তৃক নিপীড়িত হইতেছেন, তখন তিনি তাঁহাদের দুঃখমোচন করিবার মানসে তাঁহার নিজশক্তি যোগমায়াকে ব্রজে যাইতে আদেশ করিলেন।

তিনি যে ব্রজে নন্দঘোষগৃহে যশোদাগর্ভসম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা হইবেন ইহা চণ্ডীতেও উক্ত আছে—"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা" (চণ্ডী-১১-৪২)। শ্রীরাসলীলা প্রারম্ভে দেখা যায় তিনি প্রেমবতী গোপাবালাগণের মধুর রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যোগমায়াশক্তির পূর্ণ বিকাশ করেন।

"ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ (১০।২৯।১)

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ স্তুতিতেও যোগমায়াশক্তির উল্লেখ দেখা যায়—

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ক বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥" (১০-১৪-২১)

হে যোগেশ্বর, হে পরমাত্মন্ ত্রিলোকে কাহারও পক্ষে আপনার নিত্যলীলার তত্ত্ব বুঝা সম্ভব নয়। কেন না, আপনি কবে, কোথায়, কি প্রকারে যোগমায়াশক্তির বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন তাহা কাহারও জ্ঞানগম্য হইতে পারে না। এই যোগমায়া-শক্তি কেবলমাত্র শ্রীভগবানের আত্মবিমোহনকারিণী নহেন, ভক্তবিমোহিনীও বটেন। মৃৎভক্ষণ লীলায় (শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায়) শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদাকে পতিপুত্রাদিতে মমতা-মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে দেখিয়া বৈষ্ণবী-মায়ার দ্বারা তাঁহাকে বিমুগ্ধ করেন—

"ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥" (১০-৮-৪৩)

এই বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া মা যশোদা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া গেলেন না। বরং তাঁহার পুত্রস্নেহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইল— "প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা" (১০।৮।৪৪)। তিনি কিয়ৎপূর্ব্বে দৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মুখবিবরে ব্রহ্মাণ্ডদর্শন ভুলিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে কোলে লইয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। যোগমায়ার এই কার্য্যকে উন্মুখ-মোহিনী-শক্তি বলে।

ব্রহ্মমোহন লীলায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎসাদি অপহৃত হইলে শ্রীকৃষ্ণ সকল গোপবালক ও গোবৎসের রূপ ধারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ লীলা করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসীর যে মমতাধিক্য ছিল, সকল গোপবালক ও বৎসে এখন স্বয়ংরূপে বিরাজিত থাকায় মূল কৃষ্ণের প্রতি মমতাধিক্য হ্রাসপ্রায় মনে হইতেছিল। শ্রীবলরাম উহা লক্ষ্য করেন। কিন্তু রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া ব্রজে কোন মায়ার প্রভাব অনুমান করেন। তবে ইহা কোন দেবতা বা অসুর অথবা মানুষের মায়া নহে। শ্রীবলরাম বুঝিলেন যে, ইহা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের নিজমায়া। কারণ নিজ-মায়া ছাড়া অন্য কোন মায়া তাঁহাকে (বলরামকে) মোহিত করিতে পারে না।

"কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥"(১০।১৩।৩৭)

যোগমায়াদেবী যে ভগবান ও ভক্ত উভয়কে মোহিত করেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি পয়ারে তাহা অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুহাঁর রূপ-গুণে দুহাঁর নিত্য হরে মন॥"

(চৈঃ চঃ আদি—৪র্থ অধ্যায়)

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার এই দুই কার্য্য—শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণোন্মুখী ভক্তগণকে মুগ্ধ করা। ইহার দ্বারা লীলার

ঔজ্জ্বল্য সম্যক প্রকটিত হয়। এই যোগমায়া শক্তি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা মায়া। কবিরাজ গোস্বামী এই যোগমায়ার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।"

এই যোগমায়া শক্তিকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নাও বলা চলে। এই শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে "গৌতমীয় কল্পের" বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গাস্যাৎ
যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"

ইহা দ্বারা চিচ্ছক্তিরূপী দুর্গা ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভেদত্বই স্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিধিমতে শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিবার পূর্ব্বে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবার সময় কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে এই দুর্গার স্মরণ ও হৃদয়ে ন্যাস করিতে হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ নীতি অনুসারে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নই।

"মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥"

(চৈঃ চঃ আদি—৪র্থ অধ্যায়)

শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় রাসলীলার প্রথম শ্লোকে যোগমায়াশব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"যোগমায়াপরাণ্যশক্তিঃ। যত্র যত্র বিহরতি তত্র তত্রৈব সূর্য্যঃ স্বদীধিতিমিব সদাপ্রাপ্ত ইতি স্বাভাবিকতাদৃশশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতং।" অর্থাৎ সূর্য্য এবং তাহার কিরণ যেমন সর্ব্বত্রই একত্র থাকে, সেইরূপ যেখানে শ্রীহরি বিহার করেন সেইখানেই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি-স্বরূপা যোগমায়া বিরাজিতা থাকেন। শ্রীসনাতন আবার শ্লেষ করিয়া অর্থ করিয়াছেন—"শ্লেষেণ যোগঃ সংযোগং তদর্থং মায়া কৃপা মায়া দম্ভে কৃপায়াং চ ইতি বিশ্বঃ।" বিশ্বকোষ অভিধানে মায়া শব্দের একটি অর্থ হইতেছে কৃপা। শ্রীহরির সহিত যুক্ত হইবার কারণে তাঁহার যে কৃপা তাহাই যোগমায়া। এই অর্থে যোগমায়া কৃপাশক্তিরই নামান্তর। এই কৃপাশক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচণ্ডী বলিয়াছেন—

"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে॥"

অর্থাৎ তিনি বিদ্যাস্বরূপা। তিনি সনাতনী, জীবের মুক্তির হেতুভূতা। নারদ পঞ্চরাত্র এই শক্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—"অনয়া সুলভো জ্ঞেয়ো আদি দেবেরখিলেশ্বরঃ।" মহামায়ার এই শক্তি গুণাতীতা।

মহামায়ার আর একটি আবরিকা শক্তি আছে। তাহা ত্রিগুণময়ী—"যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ" (নারদ পঞ্চরাত্র)। শ্রীভাগবত এই মায়ার পরিচয় দিয়াছেন—

"যয়া সম্মোহিত জীবঃ আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।" শ্রীগীতা এই আবরিকা মায়ার উল্লেখ করিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" (গীতা-৭।১০)

এই মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া বড়ই কষ্টকর। এই মায়ার কার্য্য যিনি ভগবদ্‌বিমুখ তাহাকে মুগ্ধ করা। ইনি বিমুখ-মোহিনী। ভগবৎ বহির্ম্মুখ করিয়া জীবকে দুঃখ দেওয়াই ইহার কাজ। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

(মধ্য-২০)

এই মায়া পার হইতে না পারিলে বিষয়ানুরাগ কাটে না। জীবের সংসার বন্ধন দূর হয় না। এই মায়া অতিক্রম করা যায় কেবলমাত্র শরণাগতির দ্বারা। আর অন্য উপায় নাই।

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

আমার গুণময়ী মায়ার সাগর কিছুতেই পার হওয়া যায় না। একমাত্র আমার কাছে যিনি প্রপন্ন হন অর্থাৎ সর্বতো আমাকেই আশ্রয় করেন তিনিই কেবল এই দুস্তর মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন।—

এই মায়াকে বহিরঙ্গা মায়া বা গুণময়ী মায়াও বলে। সুতরাং চণ্ডী ও অন্যান্য শাস্ত্রানুসারে এই সিদ্ধান্ত করা চলে—মহামায়া

হইতেছেন শ্রীহরির অবিচিন্ত্য মহাশক্তি। তাঁহার দুই প্রকাশ —একটি গুণাতীত অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি ও অপরটি গুণময় বহিরঙ্গা তমোশক্তি। প্রথমটির কার্য্য ভক্ত-বিমোহন ও হরি-বিমোহন —তাহার ফল শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময়ী লীলার প্রকটন ও ভক্তদের পরমানন্দের আস্বাদ দান। দ্বিতীয়টির কার্য্য হরি-বৈমুখ-জনমোহন। সত্যকে আবরণ পূর্ব্বক বিমুখ জীবকে বিষয়জনিত সুখাভাষ ও দুঃখ দান। এই সকলই এক মহামায়ার বিবিধ প্রকাশ (Function)।

পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় ও পঞ্চম জিজ্ঞাসার উত্তরস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, তিনি "জগন্মূর্ত্তি" এবং "তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" এই দুই বিশেষণে তিনি যে বিশ্বের উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ উভয়ই বলা হইল। শ্রুতিতে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রে যাঁহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং বেদান্ত-সূত্রে জন্মাদস্য প্রভৃতির দ্বারা যাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে, মহামায়া তত্ত্বতঃ সেই পরব্রহ্মবস্তুই। এই জন্যই তাঁহাকে "সংসারস্থিতি কারিণঃ" বলা হইয়াছে। মহাশক্তি মহামায়া পরব্রহ্মের পট্টমহিষীরূপেও কথিত হইয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন বলিয়া মহামায়া পরব্রহ্মই। তত্ত্বতঃ ও কার্য্যতঃ সর্ব্বপ্রকারেই দু'য়ের একত্ব। তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানও অনন্ত। মহামায়াও তাহাই। কার্য্যতঃ ব্রহ্ম সৃষ্টি স্থিতি ইত্যাদির কারণ, মহামায়াও তেমনি। যথা—

"বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং
স্থিতিরূপা চ পালনে।

তথা সংহৃতিরূপান্তে
জগতোঽস্য জগন্ময়ে।' (চণ্ডী-১।৭৬)

উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য বস্তুতত্ত্বও তিনি, কার্য্যব্রহ্মরূপে জগন্ময়ও তিনি, আবার তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়ভূত "মহাবিদ্যাও" তিনি। এইরূপ সর্ব্বস্বরূপা, গুণময়ী হইয়াও গুণাতীতা নারায়ণী শক্তিস্বরূপিনী মহামায়া দেবীর কৃপালাভার্থ আমরা কায়মনোবাক্যে প্রণিপাত করি।

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং
শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে
নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
(শ্রীচণ্ডী—১১।১১)

—০—

চণ্ডিকার ত্রিমূর্তি

বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায়ে একটি সূত্র আছে "কম্পনাৎ"। পরব্রহ্ম শ্রীহরিপুরুষের ভয়ে বিশ্বজগৎ প্রকম্পিত। কঠ শ্রুতিতে আছে, "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"। উদ্যত বজ্রের মত তিনি মহা-ভয়ঙ্কর। তাঁর ভয়ে সূর্য্য ওঠে, অগ্নি জ্বলে, বাতাস বয়, যম পর্য্যন্ত কাঁপে।

ব্রহ্মের এই ভয়ঙ্করী শক্তিই চণ্ডী। চড়ি ধাতুর অর্থ কোপ করা। চণ্ডী অর্থ কোপময়ী। শরণাগত ভক্তকে আসুরিক আঘাত হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মশক্তি যখন ভয়ঙ্করী মূর্তি ধরেন, তখন তিনি চণ্ডিকা।

চণ্ডীর গুপ্তবতী টীকা অন্যরূপ বলিয়াছেন। "চণ্ডীনাম পরব্রহ্মণঃ পট্টমহিষী দেবতাঃ," চণ্ডী পরব্রহ্মের পট্টমহিষী দেবী। দেবী বলিতে পরমদেবের প্রধানাশক্তি উদ্দিষ্ট। ব্রহ্ম শক্তিমান, চণ্ডী শক্তি—সৃষ্টির প্রারম্ভে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দুই রূপ হইয়াছেন। ব্রহ্ম ধর্মী, চণ্ডী ধর্মী।

ব্রহ্মের শক্তি তিনটি। শ্বেতাশ্বেতর শ্রুতি বলেন, "স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ" জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি—এই প্রকাশ একই অখণ্ড শক্তির। সেই অখণ্ডিত শক্তির নামই চণ্ডী। আর ঐ ত্রিবিধ প্রকাশময়ী মূর্তির নাম মহাকালিকা, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী।

তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা বলেন, মহাসরস্বতী চিদ্‌রূপা, মহালক্ষ্মী সদ্‌রূপা, মহাকালী আনন্দরূপা। এই ত্রিত্রয়ের সমষ্টি শক্তিভূতা সচ্চিদানন্দময়ী চণ্ডিকা।

চণ্ডী গ্রন্থের তিনটি ভাগ। প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত ও উত্তম চরিত। প্রথম চরিতে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাকালিকা, মধ্যম চরিতে মহালক্ষ্মী আর মহাসরস্বতী হইলেন উত্তম চরিতের প্রতিপাদ্য দেবতা। শ্রীনারায়ণের নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা মধুকৈটভ-বধার্থ যাঁহার স্তব করিয়াছিলেন, তিনি হইলেন মহাকালী। ইনিই সৃষ্টির আদিতত্ত্ব। সংহিতা গ্রন্থে মনু বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে কিছু ছিল না, ছিল কেবল অন্ধকার, "আসীদিদম্ তমোভূতম্", ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যখন কিছু ছিল না, তখন কি ছিল? যখন পৃথিবী ছিল না, আকাশ ছিল না, রাত্রি দিনের প্রভেদ ছিল না, মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না "নাসদাসীন্নো সদাসীৎ", তখন কি ছিল?

বৈদিক ঋষির এই অনন্তজিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন বেদ নিজেই পুরুষসূক্তে। যখন কিছু ছিল না, তখন "পুরুষ" ছিলেন— "পুরুষ এবেদং সর্বং"। যাহা কিছু ছিল বা থাকিবে, সকলই সে পুরুষ হইতে। "যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং"। তন্ত্রশাস্ত্র ইহার উত্তরে তৃপ্ত নয়। তান্ত্রিক আচার্য্য জিজ্ঞাসা করেন, যখন পুরুষ ছিল না, তখন কে ছিল? নিগমশাস্ত্র বেদ বলেন, পুরুষ ছিল না এমন কখনও হয় না। আগমশাস্ত্র তন্ত্র তাহা মানিয়াও মানিতেছেন না। বলেন, পুরুষ যখন থাকিয়াও নাই, তখন কে আছেন?

থাকিয়াও নাই কথাটির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। বাড়ীর দরজায় "In" দেখিয়া আপনি আছেন জানিয়া প্রবেশ করিলাম। পরে নিদ্রিত আছেন দেখিয়া আলাপ না করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। আপনি বাড়ী থাকিয়াও নাই। পুরুষ যখন নিদ্রিত আছেন তখন কে আছেন ? আগম তাহা জানিতে চায়। নিগম উত্তর দিতে পারে না। আগমশাস্ত্রের নির্য্যাস চণ্ডী উত্তর দিতেছেন। কল্পান্তে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কারণসমুদ্রে লয় হইয়াছে, "জগত্যেকার্ণবী কৃতে।" অনন্তশয়নে ব্রহ্মপুরুষ মহাবিষ্ণু নিদ্রিত। পুরুষের সহিত অনন্ত জগৎ সুপ্ত। তখন জাগিয়া আছেন একমাত্র যোগনিদ্রা। ইনি মহানিদ্রা, মোহনিদ্রা, মহারাত্রি, মোহরাত্রি, মহাদেবী, মহাকালিকা। ইনিই শ্রীহরির নেত্রে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। "হরিনেত্রকৃতালয়াম্।" নেত্র শব্দ সকল ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণ। হরির সর্ব ইন্দ্রিয় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে এই মহাতামসী দেবী।

তন্ত্রমতে ইনিই সৃষ্টির আদি। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ইঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন। দর্শনের কাহিনী বলিতেছি। নিদ্রিত পুরুষের নাভিকমলে ব্রহ্মা-সৃজনী-শক্তি নূতন সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন। সৃজন ক্রিয়াটি স্পন্দনময়ী। স্পন্দনের মূলে গতিবেগ। বাধা ছাড়া গতি নাই। Frictionless motion হয় না। সৃজনী শক্তির বাধা উপস্থিত হইল। বিষ্ণুর কর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ দুই অসুর বেদান্ত দর্শনের আবরণ ও বিক্ষেপ, সাঙ্খ্যের রজঃ ও তমঃ গুণ—তারাই তন্ত্রশাস্ত্রের মধু ও কৈটভ। তাহারা ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইল, "হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ।" ভীত ব্রহ্মা

নিদ্রামগ্ন হরির জাগরণের নিমিত্ত তাঁহার নয়নাশ্রিতা মহানিদ্রা-স্বরূপিণী মহাকালিকার স্তব করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, "মাতঃ! তোমার শক্তিতে ভগবান হরিও যখন নিশ্চেষ্টভাবে শয়ান, তখন ব্রহ্মাণ্ডে আর কে আছে তোমার স্তুতি করিতে সমর্থ? তুমি দয়া করিয়া জগৎপতি বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ কর "প্রবোধঞ্চ জগৎ-স্বামী", অসুরদ্বয়কে মোহিত কর "মোহয়" উহাদের বিনাশের নিমিত্ত হরিকে প্রবৃত্তি দাও। "বোধশ্চ ক্রিয়তাং হন্তুং"। হরিকে প্রবুদ্ধ করিয়া অসুর বধে প্রবৃত্তি জন্মাইবার ও অসুরকে মুগ্ধ করিবার সকল সামর্থ্যই তোমাতেই বিরাজমান।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় মহাকালিকা পরিতুষ্ট হইলেন। মধুকৈটভের বধার্থ বিষ্ণুর জাগরণ ইচ্ছা করিলেন। জাগাইতে হইলে ইন্দ্রিয়ের আবরণ উন্মোচন প্রয়োজন। মহাবিষ্ণুর ইন্দ্রিয় শক্তিকে মহানিদ্রায় নিজেই তো আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন! ধীরে সে আবরণ উন্মোচন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ নিজেকে সরাইয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, বক্ষস্থল এই সকল স্থান হইতে "নেত্রাস্যনাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ" আপনি উত্থিতা হইলেন। অমনি ব্রহ্মা মায়ের নয়ন, বদন, নাসিকা, বাহু, বক্ষস্থল দর্শন করিলেন। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে ব্রহ্মার দর্শনে তিনি স্থিত হইলেন—"দর্শনে তস্থৌ।" তিনি দেখা না দিলে দেখিবার সামর্থ্য কার?

মহাকালিকা সে আবরণ সরাইয়া লইলে মহাবিষ্ণু জাগিয়া উঠিলেন। মধুকৈটভের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বধ সাধন করিলেন।

মহানিদ্রারূপিণী মহাকালিকাকে ব্রহ্মা দেখিয়াছিলেন স্পষ্টভাবে। তাই ব্রহ্মা ঋষি, দ্রষ্টা। ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব আমরাও তাঁহাকে দেখি, দেখি নিত্য সুষুপ্তিকালে। ধরিতে পারি না, বুঝিতেও পারি না কাহার শান্তিময় শীতল ক্রোড়ে গিয়া দিবস ক্লান্তি মুছিয়া যায় নূতন দিনের জন্য নবশক্তির জাগরণে। সকলের ব্যষ্টি নিদ্রার সমষ্টিভূত রূপই মহানিদ্রা। সাধারণ মানুষ মায়ের ক্রোড়ে উঠে, চেনে না, ধ্যানযোগীরা চেনে, দেখে না। ঋষি ব্রহ্মা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন।

মহাকালিকা ঘোরা অন্ধকারময়ী। সকল বর্ণ যেথায় সুপ্ত। বর্ণমালা অপ্রকাশিত। বর্ণনা চলে না। মহালক্ষ্মীতে অসংখ্য বর্ণবৈচিত্র্য প্রকটিত। মূল বীজ ফল-ফুল-সমাকীর্ণ মহাবৃক্ষে পরিণত। এই মহালক্ষ্মী প্রকাশিতা হইয়াছেন মধ্যম চরিতে।

শতবর্ষব্যাপী দেবাসুরের যুদ্ধ। দেবতারা পরাভূত। মর্ত্যের মত মর্তে বিচরণশীল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের দ্বারস্থ হইয়া দেবগণ নিজেদের স্বর্গভ্রষ্টতার কাহিনী করুণ সুরে গাহিলেন। শুনিয়া বিষ্ণু ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন। বিষ্ণুর সর্ব অঙ্গ আলোড়ন করিয়া বৈষ্ণবী তেজ বহির্গত হইল। একপ্রাণতায় শিব ও ব্রহ্মার দেহ হইতেও তুল্যরূপ রুদ্রাণী ও ব্রহ্মাণী শক্তি নির্গত হইল। সহানুভূতিবশতঃ বিমোহিত ইন্দ্রাদি দেবগণেরও দৈবী তেজ সমুজ্জ্বলভাবে বাহিরে অভিব্যক্ত হইল। সমগ্র তেজোরাশি মিলিয়া একত্রীভূত হইল। এক মহীয়সী নারী মূর্তিতে বিশ্বব্যাপী মহাশক্তি প্রকটিতা হইলেন। ইনিই তন্ত্রের মহালক্ষ্মী।

মহালক্ষ্মী দর্শন মূলতঃ বিশ্বরূপ দর্শনই। বৈচিত্র্যময় বিশাল

বিশ্বের বিভিন্ন বস্তুগুলিকে একস্থ দর্শন। বিভিন্ন বস্তুসমূহকে নানাবস্তুরূপে দেখাই ভ্রান্তদৃষ্টি। অবিভক্তভাবে দেখাই অখণ্ড দৃষ্টি, "অবিভক্তং বিভক্তেষু।" গীতোক্ত অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন তন্ত্রোক্ত মহালক্ষ্মীর দর্শন হইতে ভিন্ন কিছু নয়। মহালক্ষ্মীতে বিভিন্ন দেবতাশক্তি একই মাতৃদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল।

মায়ের মুখখানি মঙ্গলময় শম্ভু, বাহুগুলি ধারণী শক্তি বিষ্ণু, গতিময় চরণে সৃজনীশক্তি ব্রহ্মা, নয়নাগ্নিতে পাবক, স্তনযুগলে স্নিগ্ধশীতল চন্দ্রমা, কৃষ্ণকেশে অন্তক যম, ক্রোড়ে ধরণী, সর্বাঙ্গে রবিরশ্মি। শূলীর শূল, চক্রীর চক্র, কালের দণ্ড, ইন্দ্রের বজ্র সকলই মহালক্ষ্মীর শ্রীহস্তে স্থিত। অনন্ত বৈচিত্র্যময় বহুত্বে একত্বে দর্শন-মূর্তিমতী মহালক্ষ্মী।

মাতা হুঙ্কার করিলেন। সারাবিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল। অসুররাজ মহিষাসুর যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ মনে করিয়া সৈন্য লইয়া সাজিয়া আসিল। যুদ্ধও হইল ভীষণ। ফলে সগোষ্ঠী অসুররাজ কালকবলিত। মহিষাসুর জীবের আত্মকেন্দ্রিক কর্মোদ্যমের প্রতীক। নিখিল বিশ্বের একত্বানুভূতি ছাড়া আত্মকেন্দ্রিকতার বিনাশ হয় না। এই মহালক্ষ্মীর হস্তেই মহিষাসুরের জীবনাবসান। তখন পরম উল্লাসে দেবতাগণ মহালক্ষ্মীর স্তুতি আরম্ভ করিলেন। প্রার্থনা করিলেন, যখনই স্মরণ করিব তখনই মহাবিপদ হইতে রক্ষা করিবে, "সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ।

চণ্ডীগ্রন্থের উত্তর চরিতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহাসরস্বতী,

ইনি মহাশক্তি চণ্ডিকার জ্ঞানশক্তির প্রকট প্রতিমা। ইনি পঞ্চাশৎ বর্ণমালা। আচার্য্য শঙ্কর প্রপঞ্চসার তন্ত্রে সরস্বতীর ধ্যানে বলিয়াছেন—

"পঞ্চাশৎ বর্ণভেদৌ বিহিত-বদন
দোঃ-পাদ যুক্কুক্ষি বক্ষোদেশাং"

পঞ্চাশটি বর্ণমালা দ্বারা সরস্বতীর মুখ, বাহু, পদ, কুক্ষি ও বক্ষোদেশ বিহিত। তন্ত্রাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীকে পরমাত্মার সহিত অভেদ জ্ঞানে চিন্তা করিতে বলিয়াছেন, "আত্মাভেদেন ধ্যাত্বৈবং"।

মহাসরস্বতী "ত্রিজগতামাধারভূতা, গোরীদেহসমুদ্ভবা", ইনি শুম্ভাদি দৈত্যের বিনাশকারী। দেবতাগণের স্তুতির পরে পার্বতীর শরীরকোষ হইতে ইঁহার আবির্ভাব। শুম্ভ অসুরবধ প্রসঙ্গে স্বরূপের পরিচয়।

দশম অধ্যায়ে শুম্ভবধ প্রসঙ্গ, তৎপূর্বে হইয়াছে মহাসুর রক্তবীজের পতন। রক্তবীজের প্রতি ফোঁটা রক্ত হইতে তৎতুল্য একটি অসুর আবির্ভূত হইত। তাই তাহাকে বধ করিতে মা অন্যান্য শক্তিগণের সাহায্য লইয়াছেন। বারাহি, নারসিংহী, চামুণ্ডা, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, কৌমারী, শিবদূতী, বৈষ্ণবী শক্তি প্রভৃতি মাতৃগণ মিলিয়া ক্রোধের মূর্তি রক্তবীজের বধ সাধন করিয়াছেন। পূর্ব অধ্যায়ে নিশুম্ভ বধ হইয়া গিয়াছে। ভ্রাতার মৃত্যুতে কাতর হইয়া প্রবল ক্রোধান্বিত শুম্ভ যুদ্ধে আসিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া শুম্ভ দেখিল পার্ব্বতীর পক্ষে অগণিত দেবীমূর্তি যুদ্ধেরতা।

দেখিয়াই সে চটিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিল, ওরে বলগর্বে দুর্বিনীতা দুর্গা! আমার সৈন্যসামন্ত বধ করিয়া কিসের গর্ব করিস? তোর সঙ্গে কথাই বা ছিল কি, আর এই বা দেখি কি? যে যুদ্ধে পরাভূত করিবে, তুই তার বশীভূতা হবি। এতগুলি লোক ভাড়া করিয়া আনিবার তো কোন সর্ত ছিল না। ধারকরা শক্তি লইয়া যুদ্ধ করিয়া আবার উঁচু মুখে গর্ব! 'অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানীনীং'।

অসুররাজের ক্ষিপ্ত হইবারই কথা। তাহার সমগ্র সৈন্যবল বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ভাগিনেয় রক্তবীজ গিয়াছে, ভাই নিশুম্ভ গিয়াছে। রহিয়াছে সে শুধু একা। অপরপক্ষে চণ্ডিকার কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাই। তিনি বহু দেবীগণ সঙ্গে পূর্ণশক্তিতে বিরাজমানা এমতাবস্থায় রোষে ক্ষিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে কে? অসুর তাই 'মা' সংগ্রাম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া ক্রোধভরে জবাবদিহি করিল।

অসুরের কথা শুনিয়া দেবী গম্ভীর নাদে উত্তর করিলেন, ওরে দুষ্ট! এ জগতে আমি তো একাই আছি। অনন্তবিশ্বে আমার দ্বিতীয় তো কেহ নাই! "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"

অসুর আরও রাগিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রত্যক্ষে দেখা যাইতেছে যে, সে বহু শক্তি পরিবৃত, তবু মুখের জোরে আমি একাই বলিয়া আস্ফালন করিতেছে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়া আর কোন জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিলে সে আর অসুর হইবে কিরূপে? তত্ত্বজ্ঞানের অস্বীকৃতিতেই তো অসুরত্বের গরিমা।

অসুর মূর্ত অজ্ঞানতা, জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানকে বধ করিতে হইবে। মহাসরস্বতী ছাড়া এই বিরাট অজ্ঞানতার হননকর্ত্রী আর কে আছে? ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্— এই শ্রুতিবাণীই সরস্বতী। কিন্তু এই বাণীমাত্রেই অজ্ঞানতা মরে না। অজ্ঞানতার চিরমরণ ঘটাইতে চাই মহাসরস্বতী। মহাসরস্বতী সরস্বতীর শাশ্বত বাণীর মূর্ত বিগ্রহ।

শ্রুতিবাণীর প্রকট প্রতিমা মা বলিলেন, "দুষ্ট! আমি দ্বিতীয় রহিতা। ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করিতেছিস না? এই দেখ্ "পশ্যৈতা দুষ্ট!" এরা সব আমারই বিভূতি; আমাতেই প্রবেশ করিবে "মষ্যেব বিশন্ত্যো।"

মা এই কথা বলিতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য প্রকটিত হইল। প্রত্যেকটি মাতৃকাশক্তি মায়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। "ততোজগ্মুঃ", সর্বশেষে অম্বিকা একাই বরাজমান রহিলেন, "একৈবাসীৎ তদাম্বিকা"

বলিলেন, "এই দেখ্! আমি বিভূতি দ্বারা বহু মূর্তিতে অবস্থান করিতেছিলাম, এই তাহা প্রত্যাহার করিলাম। "তৎ সংহৃতঃ ময়া।" এখন একাই আছি "একৈব তিষ্ঠামি।"

অদ্বিতীয়া ব্রহ্মরূপিণী চণ্ডিকার বিভূতি সকল তাহারই লীলাবিলাসমাত্র। ইঁহাদের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। আসুরিক বুদ্ধি এই মহাতত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ। মা তাই অপরোক্ষনুভূতিকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দেখাইলেন। মাকড়শা যেমন স্বদেহ হইতে সূত্র উৎপাদন করে, আবার স্বদেহেই লয় করে, এও সেইরূপ। ইচ্ছাশক্তির বিলাসে বিভূতি প্রকাশ। ইচ্ছা মাত্রে স্বীয় সত্তার

সংহরণ। এই মহাতত্ত্বের মূর্তি দর্শনেই অজ্ঞানতা অসুরের মৃত্যু, পরবর্তী যুদ্ধ বহিরঙ্গ খেলা মাত্র।

মহাকালিকা অন্ধকারবর্ণা। সকল তত্ত্ব সেথায় অব্যক্ত। মহালক্ষ্মী বৈচিত্র্যময়ী, নিখিল তত্ত্ব সেথায় সুপরিস্ফুট। মহা-সরস্বতী শুভ্র জ্যোৎস্নাধবল, নিখিল বৈচিত্র্যের পরম একত্বে পর্যবসন। তন্ত্রের তত্ত্বের এই ছক (formula) বিরাটের সামগ্রিক জীবনে যেরূপ সত্য, অণুচৈতন্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনেও সেইরূপ সত্য।

দীর্ঘ ইতিহাসের অন্ধকার হইতে মানুষ বৈচিত্র্যময় জগতে আসিয়াছে। এই বৈচিত্র্য মধ্যে একত্বের দর্শনেই তাহার জীবনের সার্থকতা। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যেখানে যত দ্বন্দ্ব, তাহার সমাধান হয় সরস্বতী সাক্ষাৎকারে। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা তখনই কল্যাণ, যখন দুর্দমনীয় তাণ্ডবে মানব সমাজ আজ বিপর্যস্ত। এই শারদীয় মহাপূজায় আমাদের জীবনমণ্ডপে মহাসরস্বতীর আবির্ভাবে বিপদের ঘোরঘনঘটা বিলীন হইয়া যাক, মহামাতৃকার প্রাণমন্ত্রে বাংলা তথা ভারতের নরনারী প্রেমসমৃদ্ধ জীবনের পবিত্র জ্যোৎস্নালোকে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক।

শ্রীশ্রীকালিকার স্বরূপ

কালী মহাকালের শক্তি মূর্ত্তি। যাহা কিছু কালে ছিল, আছে এবং থাকিবে—সকলই মহাকালীতে চিরবিদ্যমান। অনন্ত অতীত, অনন্ত ভবিষ্যৎ একটি নিত্য মূর্ত্তির মধ্যে শাশ্বতভাবে বিরাজিত।

সৃষ্টি ও ধ্বংস, প্রকাশ ও বিনাশ একই মহাশক্তির পরস্পর সাপেক্ষ বিবিধ বিকাশ। বীজ ধ্বংসে বৃক্ষের জন্ম, বাল্যের ধ্বংসে যৌবনের উদয়, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃতত্বের আস্বাদন। ভারতীয় ঋষিদের ইহা অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। ধ্বংসের মধ্যে তাঁহারা অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, অপার করুণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সেই করুণাময়ী সৌন্দর্য্যময়ী ধ্বংসের মহাশক্তি বিগ্রহমূর্ত্তিই কালিকা। কেবল ধ্বংসের নহে বিশ্বের সৃজন পালন বিনাশকারী যাবতীয় শক্তিই কালিকাতে বিরাজিত। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে যতগুলি ভাব অভিব্যক্ত হয় মানুষের কাছে, শ্রীকালিকাতে সে সকলই বিরাজমান। মহাপ্রকৃতির পরিপূর্ণ চিত্র কালিকা। এই স্বরূপ ভক্তের ধ্যান নেত্রে দর্শনীয়।

কালির হস্ত চারখানি। দুই হাতে পালন করেন, দুই হাতে নিধন করেন। বামদিকের হস্তে খড়্গ এবং মুণ্ড ভীষণ ধ্বংসের চিহ্ন। দক্ষিণ দিকের দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রায় পরম কল্যাণ প্রকটিত। এক হাতে আঘাত, আর এক হাতে সান্ত্বনা। এক হাতে ভীতি প্রদর্শন অপর হাতে সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ। এমন

বিরুদ্ধতার অপূর্ব্ব সমন্বয়, সামগ্রিকতার পূর্ণ অভিব্যক্তি—সমগ্র প্রকৃতির শক্তির এমন পূর্ণতম প্রতীক সারা বিশ্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। দেবীর গলদেশে মুণ্ডমালা বিভূষিত। মুণ্ড হইতেছে জ্ঞান শক্তির আধার। জ্ঞানরূপ মুণ্ডমালা মহাশক্তির কণ্ঠ-বিভূষিত। মুণ্ড সংখ্যা পঞ্চাশৎ। উহা পঞ্চাশটি সংস্কৃত বর্ণমালার প্রতীক। বর্ণমালা শব্দ-ব্রহ্মের বহিরঙ্গ প্রকাশ। আর্য্যঋষি শব্দব্রহ্ম (Logs) তত্ত্বের গভীর তলদেশে বিচরণ করতঃ মহাশক্তির রত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। কালিকার কণ্ঠে নরমুণ্ড সুগভীর মন্ত্রশক্তির প্রতীক চিহ্ন।

মায়ের পশ্চাতে আলুলায়িত কেশরাশি। যেন একটি পরদা। পিছনটা ও মধ্যটা আমাদিগকে দেখিতে দিবেন না, "যাম্যেন স্বভবৎ কেশাঃ"—যমের শক্তি হইতে কেশ হইয়াছে। জীবনকে রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছে মৃত্যুর আবরণ দ্বারা। কোন বৈচিত্র্যময় জগতের চরম তত্ত্বকে রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

কালিকা দেবীর অঙ্গবর্ণ কৃষ্ণ। সর্ব্বধর্ম্মের বিলয়ভূমি কৃষ্ণই। অনন্ত অন্ধকারেই কালীর যথার্থ রূপ। ঋগ্বেদ গাহিয়াছেন, "তমসাসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে"—আদিতে অন্ধকার, মধ্যে অন্ধকার গূঢ়ভাবে লুক্কায়িত ছিল; আদিতে ছিলেন বলিয়াই তো তিনি আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি বলিয়াই তিনি অন্ধকার বর্ণা। পরমহংসদেব বলিতেন—"কালি কি কালো? দূরে তাই কালো। আকাশ দূরে তাই নীল, কাছে রং নাই। সমুদ্রের জল দূর হইতে নীল দেখায়, হাতে তোল কোন রং নাই"। মহাশক্তি নিরাকার তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। কালী দিগম্বরী। দিক দেশ

দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই বিবসনা। দেশকালের বন্ধনে সীমাবদ্ধ নহে ; অসীম তিনি ইহা বুঝাইতেই দিগ্বসনা মূর্ত্তি।

মৃত ব্যক্তির ছিন্ন হস্ত দ্বারা একটি মেখলা। হস্ত কর্ম্মশক্তির আধার। মৃত জীবগণের কর্ম্মফল মহাকালের অবিদ্যার অংশে আশ্রয় লয়। ঐ কর্ম্মফল বশতঃই তাহাদের আবার জন্ম হইবে। জীবের অভুক্ত কর্ম্মফল প্রলয়ে মহাপ্রকৃতির গর্ভে নিহিত থাকে, পরবর্ত্তী কল্পে ভোগের নিমিত্ত। তাই মহামায়ার কটিতে নৃকরমালা দোদুল্যমান।

জননী ত্রিনয়না। ত্রিনয়নে চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নি, অন্ধকার বিধ্বংসী এই তিন শক্তির বিকাশ। তিন নয়নে মাতা তিন কাল দেখেন। সত্য শিব ও সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করান। মায়ের বক্ষস্থিত উন্নত স্তন ক্ষীর পরিপূর্ণ। এক স্তন দ্বারা জগৎ পালন করেন আর এক স্তনধারায় সাধকগণকে পরমা মুক্তির অমৃতাস্বাদন করান।

জননীর রক্তবর্ণ জিহ্বা রজোগুণের সূচক। শুভ্রতা সত্ত্বগুণের প্রতীক। শুভ্র দন্তের দ্বারা রসনা দংশন করিয়া সাধকদিগকে সত্ত্বগুণের দ্বারা রজঃগুণকে সংহত রাখিতে শিক্ষা দিতেছেন।

ব্রহ্মপুরুষ শিব চরণতলে থাকিয়া তিনিও যে মহাশক্তির অধীন তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। পুরুষ শুধু অধ্যক্ষ বা দ্রষ্টা বা ঈক্ষণকারী। মহাপ্রকৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডময় নিয়ত নৃত্যশীলা বা ক্রীড়াপরায়ণা। মহাশক্তির বাসস্থান শ্মশান। শ্মশান বলিতে শবের শয়নস্থান। কর্ম্মফল ভোগান্তে জীবের

শেষ বিশ্রামস্থান শ্মশান। সেই শ্মশানে কালী বাস করেন। কল্পান্তে তাঁহার আশ্রয়ে সকলে বিশ্রাম পায়। আমাদের প্রাত্যহিক প্রলয়ে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও আমরা যোগনিদ্রা-রূপিণী ঐ কালিকার স্নিগ্ধ শীতল ক্রোড়ে শান্তিলাভ করি। ব্যাধি-সন্তাপ-বিরহ বেদনা উদ্বেগ সর্ব্বতোভাবে মুছাইয়া দেন ঐ শ্মশানবাসিনী জননী কালিকা। জননীকে বলা হইয়াছে ভীষণ বদনা—"করাল বদনাং ঘোরাং"—বিকট করাল দংষ্ট্রা সমন্বিতা। দেখিলেই মহাভীতির উদয় হয়। সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইয়াছে—"সুখ প্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্"—সুখাতিশয্য হেতু সুপ্রসন্ন বদনমণ্ডল। মুখপদ্মে মৃদুহাসি শোভমান।

একই কালে বিরুদ্ধতার নিরুপম সমাবেশ। আসুরিক শক্তির সহিত যুদ্ধের সময়—"চিত্তে কৃপা সমর নিষ্ঠুরতা"—এক অনির্ব্বচনীয় ভাব। কালিকারূপিণী এই মহাশক্তি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় নরনারীর পরমা জননী। ইনি প্রসবিত্রী, ধাত্রী, পালয়িত্রী। ঈশ্বর স্রষ্টা, জীব সৃষ্ট—জীবেশ্বরের এই সম্বন্ধই পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই। খ্রীষ্টধর্ম্ম ঈশ্বরে পিতৃস্বরূপের ভাবও জানাইয়াছে। একমাত্র হিন্দুঋষি ঈশ্বরে পরম মাতৃত্বের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন। পিতা অপেক্ষা মাতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ নিবিড়তর। মাতৃ সম্বোধন অধিকতর প্রাণস্পর্শী এবং সান্ত্বনাদায়ক। ক্রীড়াক্লান্ত শিশু মাতৃবক্ষে আরাম ও বিশ্রান্তি লাভ করে। আর্য্যঋষি পরমকারণকে কেবল মা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—বিশ্বের সর্ব্বভূতে এ মাতৃত্বের প্রকাশ দেখিয়াছেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—। মায়ের মূর্ত্তির

দিকে দৃষ্টিসম্পাত করিয়া ভক্ত সাধক দেখেন বজ্রকঠোর পুষ্প-কোমল শাসন গর্জন পালন-পোষণ অতি সৌম্য, অতি রৌদ্র ব্রহ্মময়ী শক্তির এক করুণাস্নিগ্ধ বিরাট মাতৃত্ব। ইহাকেই অর্চ্চনা করি। ইঁহারই চরণে ক্ষুদ্র আমিত্ব জলাঞ্জলি দিয়া, ইহারই ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া হিন্দুভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। সর্ব্বভূতে মাতৃত্বের দর্শনে সাধক কামজিৎ হন। কামের বিনাশে প্রেমের উদয় হয়। প্রেম আসিলে ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়। মানবজাতির ঐক্য দৃঢ়তর হয় আজ সমাজে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন জাতীয় একতা। প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর তাই প্রার্থনায় কালিমাকে বলিয়াছেন—

"এস মা পাগলা কালী—
লয়ে প্রেমের ডালি—".

অষ্ট-শক্তি

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা"

অনন্ত বিশ্ব জগতের মূলে আছেন একটি মহাশক্তি। তাহা হইতেই সকল বস্তুর উদ্ভব, তাঁহার অঙ্কেই স্থিতি, আবার তাঁহার অঙ্গেই শেষ পরিণতি লাভ। এক হইয়াও তিনি আপনাকে ব্যক্ত করেন নানারূপে। বহুত্বের মধ্য দিয়াই তাঁহার একত্বের বিকাশ।

ভারতসমর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, এই মহাশক্তির স্তব করিতে। চণ্ডীগ্রন্থ এই মহাশক্তিকে জগৎপতি হরির যোগনিদ্রা কহিয়াছেন। স্তবে অর্জ্জুন মহাশক্তিকে কৌমারী কালী কপালিনী কান্তারবাসিনী প্রভৃতি বহু নামে অভিহিতা করিয়াছেন।

গীতায় ভগবান অর্জুনকে কহিয়াছেন, আপনার আটটি প্রকৃতির কথা। ভূমি, অপ, অনল, অনিল, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহংকার। শকুন্তলা নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে কালিদাস কবি শ্রীশিবের অষ্ট মূর্তির কথা বলিয়াছেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য ও যজমান। অষ্ট প্রকৃতি ও অষ্ট মূর্তির মধ্যে সাদৃশ্য অনেক। ইহারা জগৎ সৃষ্টির উপাদানীভূতা।

অর্গলা স্তোত্র বলিয়াছেন দশটি মূর্তির কথা—জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধা! এই দশরূপে দশদিক প্রতিপালন করেন। দেবীকবচ

নবদুর্গা নামে নয়টি মূর্তির সন্ধান দিয়াছেন—শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চণ্ডঘণ্টা, কৌমারী, স্কন্দমাতা, কল্যাণী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী। ইঁহারা সকলে বিশ্বের রক্ষয়িত্রী শক্তি।

চণ্ডীর অষ্টম অধ্যায়ে আছে অষ্ট শক্তির কথা বিশদভাবে বর্ণিত। তাঁহারা আসিলেন রক্তবীজ বধে মা দুর্গাকে সাহায্য করিতে। চণ্ড ও মুণ্ড দুই মহাসুরের পতন হইয়াছে। অসুর রাজ রাগিয়া আগুন। আদেশ দিলেন তিনি অগণিত সৈন্যকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া নির্গত হইতে। দুর্গাকে হয় বধ করিতে হইবে, নয় কেশাকর্ষণে গৃহে আনিতে হইবে।

শত্রু সৈন্য আসিতে দেখিয়া মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দিলেন ধনুকে টঙ্কার। বাজাইয়া দিলেন মহাঘণ্টা। সিংহ করিল হুঙ্কার। কালিকা দেবী করিলেন মহাশব্দ। তাহাতে দিগমণ্ডল গেল পূর্ণ হইয়া। দেবতারা হইলেন ভীষণ চিন্তিত। রক্তবীজ চলিয়াছে সেনাপতি হইয়া। ওর এক ফোটা রক্ত যদি মাটিতে পরে, প্রতি ফোটা হইতে ওর মত শক্তিশালী আর একটা রক্তবীজ জন্মাবে। এমন শত্রুর সঙ্গে লড়াই সহজসাধ্য নয়।

উদ্বেগের আধিক্যে দেবতাদের অঙ্গ হইতে বিনির্গত হইলেন তাঁহাদের শক্তিগণ। তাঁহারা মহাদেবীরই শক্তি, ছিলেন তাঁহারা দেবগণের মধ্যে। দেবগণের মধ্যে থাকাকালেও তাঁহারা মহাদেবী হইতে অভিন্না হইয়া অখণ্ডরূপে ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা প্রকটিতা হইলেন। মনে হয় যেন পৃথক পৃথক। ইহারা কিন্তু বাস্তবে একই স্বরূপ। ইহাদের পরম একত্ব পূর্ণভাবে প্রকাশ

হইবে, সেই সময় যে সময় মাতৃকা শক্তিগণ আবার মিশিয়া এক হইয়া যাইবে মহাদেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

অষ্টশক্তি আসিলেন। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, যজ্ঞবারাহী, নারসিংহী ও চণ্ডিকা। প্রথমোক্ত সাত মূর্তি আসিলেন, অষ্টম চণ্ডিকা দেবী ব্যক্ত হইলেন মহাদেবীর দেহ হইতে। ইনি যেন শক্তিরও শক্তি। ইঁহার অপর নাম অপরাজিতা ও শিবদূতী।

যে দেবতার যেই রূপ তাঁহার শক্তিরও সেইরূপ। যে দেবতার যে কার্য, তাঁহার শক্তিরও সেই কার্য। অথবা তন্ত্রের দৃষ্টিতে কথাটাকে আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয়—ঐ ঐ শক্তির অন্তঃ প্রবেশের ঐ ঐ দেবতার ঐ ঐ রূপও কার্য হইয়াছে। শক্তি হইতেই ত শক্তিমানের প্রকাশ। বিষ্ণুকে বিষ্ণুত্ব দিয়াছেন যে শক্তি, তিনিই বৈষ্ণবী শক্তি। নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন কিসের বলে ? অবশ্যই শক্তির বলে। ঐ শক্তি সেই কালে ছিল নরসিংহে অমূর্ত। আজ মূর্ত হইয়া প্রকটিতা হইলেন নারসিংহী রূপে। বরাহ দন্তাগ্রে ধরণী তুলিয়াছিলেন যে শক্তির জোরে তিনিই বারাহী শক্তি। তখন ছিলেন বরাহের অন্তরে অমূর্ত। আজ মূর্তি ধরিয়া আসিলেন রণক্ষেত্রে মহাদেবীর সহায়ক হইতে। অঙ্গীরই অঙ্গ। অঙ্গের কার্য হইল অঙ্গীকে রক্ষা করা ; হস্তপদ যেমন করে দেহকে। শক্তিগণ মূর্ত হইয়া আসিলেন মহাশক্তিকে সেবা করিতে।

শক্তিগণের রূপ, ভূষণ, বাহন ও কার্য সবই শক্তিমানের অনুরূপ। শক্তিমানে ত শক্তিরই প্রকাশ। প্রথমে আসিলেন

ব্রহ্মাণী। ইনি ব্রহ্মার মূলীভূত শক্তি। ইনি সৃজনী শক্তি নাদ ও শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী। ইনি আসিলেন হংস চালিত বিমানে—'হংস' হইলেন 'অহংস', সোঽহং' এই ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞানের স্বরূপ। এই জ্ঞানের শিখরেই শব্দব্রহ্ম বিরাজমান। আসিলেন তিনি হাতে লইয়া অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। অক্ষমালায় মন্ত্রশক্তি প্রকাশ আর কমণ্ডলুতে অমৃত বারি। উহা ছিটাইয়া তিনি ভক্ত রক্ষা করেন অভক্ত নাশ করেন। বস্তুতঃ নাশ কাহাকেও করেন না—অভক্তের অভক্তিকে নাশ করিয়া জ্ঞানে সঞ্জীবিত করেন। ব্রহ্মাণীর পরে আসিলেন মাহেশ্বরী। ইনি মহেশ্বর বা রুদ্রের শক্তি। ইহার প্রধান কার্য হইল সংহারাত্মক। শব্দব্রহ্মের পশ্চাতেই ইনি থাকেন। ইনি ধ্বংস করিয়া দিলে শব্দব্রহ্ম সৃজনকর্ম করিবেন। শঙ্করী ভাঙ্গিলে ব্রহ্মাণী গড়েন। একটি কর্মেরই এপিঠ ওপিঠ।

মহেশ্বরী বৃষভারূঢ়া। করে ত্রিশূল মস্তকে চন্দ্রকলা। দুই বাহুতে বলয়ার দুই মহাসর্প। বৃষ ধর্মের প্রতীক। ত্রিশূল ত্রিগুণনাশকারী নির্গুণতত্ত্বের জ্ঞানশূল। চন্দ্রকলায় করুণা মাখা স্নিগ্ধতার সঙ্কেত। সামরিক নিষ্ঠুরতার মধ্যেও করুণা ধারা। সর্পদ্বয় অনন্ত ও বাসুকী আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি। একবার ছাড়িয়া দেন আর একবার টানিয়া তোলেন। মহা-রাত্রিতে সব অবশ হইয়া তাহাতেই ঘুমায়। ধ্বংস করেন ইনি নিষ্ঠুরভাবে অসুরের আসুরিকতা।

মহেশ্বরীর পশ্চাতে কৌমারী। দেব সেনাপতি কুমারের ইনি সমগ্র শক্তি! ইনি ক্ষত্রশক্তির মূর্তি! ক্ষত হইতে ত্রাণ

করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়। কোথাও ক্ষত আহত দেখিলে ইনি প্রতিকার না করিয়া ছাড়েন না। ইহার এক বিশেষণ গুহ-রূপিণী। ইনি গোপন করেন স্বকীয় সৈন্যদল শত্রুর দৃষ্টি হইতে। সুতরাং ইনি যুদ্ধ-কৌশলী। ইনি ময়ূরবাহনা, শক্তিহন্তা। ময়ূর কামভোগ করে না, রিপুজয়ী, কালসর্প খায়, কালজয়ী। তাহার উপরে স্থিতা দেবী করে ধরেন শক্তি। শক্তি একপ্রকার লৌহনির্মিত বর্শা। দুইপার্শ্বে তীক্ষ্ণ, হস্তক্ষেপা। কৌমারীশক্তি চিরকুমারী কখন দেখা দেয় না বার্ধক্য ইহার স্বরূপে। ইনি আত্মরক্ষায়, সত্য-রক্ষায় রণ-নৈপুণ্যের ও চিরকৌমার্য্যের প্রকট মূর্তি।

তারপর আসিলেন বৈষ্ণবী-শক্তি। সর্ব-নরের যিনি আশ্রয় সেই নারায়ণের ইনি শক্তি। এই শক্তি বলেই নারাগণ জগৎ পালন রক্ষণ করেন। ইনি গরুড়াসনা। চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শৃঙ্গের হাতলযুক্ত এক খড়্গ। যুদ্ধ করিবেন কিনা তাই পদ্মের পরিবর্তে আনিয়াছেন খড়্গ। গরুড় সত্ত্বগুণ প্রধান, ঊর্দ্ধগতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টি ইহার দুই বৈশিষ্ট্য। শঙ্খে প্রণবনাদ, চক্রে কর্মপ্রবাহ, গদায় ন্যায়দণ্ড, খড়্গে তত্ত্বজ্ঞান। ইহারা জগৎকে স্থিত রাখেন। সত্ত্বগুণের আশ্রয়ে মন্ত্রশক্তি উদ্বোধন। জ্ঞানাসি দ্বারা দ্বন্দ্ব ও অনৃতকে ছেদন। একত্ব ও ঋত স্থাপনে জগতের রক্ষা। আসুরিক ভাবের ভূমিতে সত্য-ধর্ম সংস্থাপনে এই বৈষ্ণবী-শক্তি নিত্য নিরত।

তারপর আসিলেন যজ্ঞবরাহের শক্তি বারাহী। ইনি বরাহ-রূপিণী। ইনি বসুন্ধরাকে দন্তে তুলিয়াছেন। ইনি যজ্ঞময়ী।

ধরণী যখন পাপে অধোগামী হয় তখন যজ্ঞই তাহাকে তুলিয়া ধরে। বরাহ হিরণ্যাক্ষ অসুরকে বধ করিয়াছেন। হিরণ্যের প্রতিই যার অক্ষি অর্থাৎ যার লোলুপদৃষ্টি কেবল সুবর্ণের দিকে সেই ভোগসর্বস্ব জীবনই হিরণ্যাক্ষ। তাহার বিনাশ ঘটে যজ্ঞের মাধ্যমে। ত্যাগ দ্বারাই ভোগের ক্ষয়। তাই বারাহী সিংহ-বাহিনী। ইহার দুই করে গদা ও চক্র, কর্মের চক্র ও ধর্মের গদা ইহার সহায়। ইহার মস্তকের চারিদিকে জয়লক্ষ্মী চামরের সুন্দর শোভা।

অতঃপর নারসিংহী শক্তির আগমন। ইহা ঠিক নরসিংহের তুল্য দেহধারিণী। কেশর সঞ্চালনে গগনের নক্ষত্র রাজিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে এই ভীষণা শক্তির আবির্ভাব। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু বধের জন্য ইনি আবির্ভূতা। ইহার মূর্তি অর্দ্ধমানবী অর্দ্ধসিংহী। চক্ষু দুইটি তপ্ত লৌহের মত, মুখে চোখে ভীষণ ভ্রূকুটিভরা। বিশাল বক্ষ, ক্ষীণকটি, শ্রীবদনে অপূর্ব উজ্জ্বলতা। শরীরের সর্বাংশে চন্দ্রকিরণ সদৃশ স্নিগ্ধ লোমরাজি বিরাজিত। ইনিই শ্রীহরির রৌদ্র ও বীভৎস রসের মূর্তি। অতঃপর ঐন্দ্রী শক্তির প্রকাশ। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি। যে শক্তিবলে দেবরাজ রাজশক্তি পরিচালনা করেন সেই শক্তি। ইনি সাম্রাজ্ঞীর মত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা, বিদ্যাভরণভূষিতা, গজবাহনা। গজকুম্ভোপরি উপবিষ্টা, হস্তে রাজদণ্ডতুল্য বজ্র। ঐন্দ্রী সকল ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি। জীবের চক্ষুকর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা ও ত্বকের সঙ্গে বিশ্বের রূপ শব্দ গন্ধ, রস ও স্পর্শের নিবিড় সম্বন্ধ। ইহার নিয়ন্ত্রণকারিণী শক্তিই ঐন্দ্রীশক্তি। বাহিরে

মেঘাদি প্রাকৃতিক শক্তির উপরে, অন্তরে মননাদি শক্তির উপরে ইহার অধিকার।

ইহারা সকলে আসিলেন স্বর্গ হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর চণ্ডিকা বহির্গতা হইলেন মহাদেবীর শ্রীঅঙ্গ হইতে। ইহার অপর নাম অপরাজিতা। ইনি অতি ভয়ঙ্করী, শতশিবা বেষ্টিতা। ইনি ভয়ানক রসের মূর্তি। সাক্ষাৎ শিবকে দূত করিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডিকার অপর নাম শিবদূতী। ইনি শিবকে কহিয়াছিলেন—"আপনি গর্বিত দানব শুম্ভনিশুম্ভকে বলুন—ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য করিবে, দেবগণ যজ্ঞের আহুতি ভোগ করিবে—আর তোমরা যদি বাঁচিতে চাও পাতালপুরী প্রস্থান করিবে—আর এই কথা না গ্রাহ্য করিয়া বলগর্বে যুদ্ধ অভিলাষ কর তাহা হইলে এস, আমার শৃগালগণ তোমাদের দানবমাংসে তৃপ্তি লাভ করুক।"

চণ্ডিকা মহাকালের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি। গীতায় যিনি, "কালোঽস্মি" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার প্রকট মূর্তিই চণ্ডিকা। অনন্ত বিশ্বে সবাই কালাধীন সুতরাং ইহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না—তাই অপরাজিতা নাম। ইহার বর্ণ সিন্দুরের মত। শূল চক্র পাশ ও বর্মধারিণী। ইনি শিবা ও শবপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা। এত ভয়ঙ্করী হইয়াও ইনি শিবদূতী, কল্যাণময় শিবকে ইনি দূত পাঠান। মহাধ্বংসের মূলেও অনন্ত কল্যাণ অন্তর্নিহিত। ভীষণভাবে বিনাশ করেন নবীনভাবে বিকাশের জন্য।

এই অষ্টশক্তি আমাদের বিষয়বাসনারূপী রক্তবীজ বিনাশ করিয়া বিশ্বময় মাতৃভাবের উদ্দীপনা বিকশিত করুন।

॥ নবদুর্গা ॥

মা দুর্গার নয়টি নামকরণ করিয়াছেন, পিতামহ ব্রহ্মা। নয়টি নামে নয়টি রূপভেদ ও ভাবভেদ। ইহারা দেবীর নয়টি কায়ব্যূহ মূর্ত্তি। নবদুর্গা ইহাদের খ্যাতি। সংবাদ পাওয়া যায় ইহাদের দেবী কবচ স্তোত্রে ঃ

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।
তৃতীয়ং চণ্ডঘণ্টেতি কুষ্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥
পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা
সপ্তমং কালরাত্রীতি মহাগৌরীতি চাষ্টমম্
নবমং সিদ্ধিদাত্রীতি চ নবদুর্গাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

শৈলপুত্রী

নবদুর্গার প্রথম নাম শৈলপুত্রী। শৈল পদে পর্বত। এখানে শৈল বলিতে হিমাচল নামক গিরিবরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। দেবীকে দুহিতারূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন গিরিরাজ হিমালয়। তার ফলস্বরূপ লভ্য পুত্রী।

দক্ষরাজের শিবহীন যজ্ঞে দেহত্যাগ করেন সতী স্বামীর নিন্দা শ্রবণে। মহেশ্বর নাচিয়া বেড়ায় উন্মাদের মত সারা বিশ্ব সতীর দেহ স্কন্ধে লইয়া। একান্ন খণ্ডে দেহকে কাটিয়া ফেলেন চক্রদ্বারা বিষ্ণু স্বয়ং। দেহ স্কন্ধে নাই দেখিয়া ভোলানাথ হন তপস্যামগ্ন। শক্তি লাভের জন্য শিবের তপস্যা।

অসুরের অত্যাচারের দেবকুল বিপর্য্যস্ত। বারংবার হারিয়া যান তারা অসুরের হাতে। ইহার হেতু হইল সেনাপতির অভাব। পরামর্শ দিলেন ব্রহ্মা দেবতাদের দেবসৈন্যে যোগ্য সেনাপতি হইবে সেই কুমার যে জন্মিবে হর-গৌরীর মিলনে। আকুল প্রার্থনা করেন দেবেরা মা দুর্গার পাদপদ্মে পুনর্বার ধরণীতে আবির্ভূতা হইবার জন্য। তাই আসিলেন দেবী শৈলপুত্রী হইয়া। তাহাতে ফল হইল তিনটি। দেবতার কার্য্য সাধন, হিমালয়ের বাঞ্ছা পূরণ, শিবের তপস্যার পরিপূর্ত্তি।

ব্রহ্মচারিণী

শৈলপুত্রীর অপর নাম উমা হৈমবতী। ইনি ব্রহ্মচারিণী। "ব্রহ্মচারয়িতুং শীলমস্যাঃ।" ব্রহ্মজ্ঞান দান, ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করান যার স্বভাব। দেবরাজ ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞান ইনি ব্রহ্মচারিণী-রূপে। কাহিনীটি শুনাইয়াছেন উপনিষদ।

দেবাসুরের সংগ্রাম লাগিয়াই আছে—শতবর্ষ ধরিয়া জীবন ভরিয়া। একবার যুদ্ধে জয় হয় দেবতাদের। ইহাতে খুব গর্ব্ব অনুভব করেন দেবতারা। গর্ব্বের বোধ করেন তারা দলগত ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে। এবার জয়ের কৃতিত্ব আমারই মনে মনে ভাবেন অগ্নি, বায়ু সব দেবতারাই। হইলে কি হইবে দেবতা। গর্ব্বে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন সকল জয়ের মঙ্গল উৎস যিনি তাঁহাকে। মূল কর্ত্তাকে ভুলিলেই আসিবে কর্ত্তৃত্বাভিমান, অহংকার। অহংকারে বিমূঢ় ব্যক্তিই ভাবে আমি কর্ত্তা। এ বাণী আছে গীতাতেও।

একদিন সমবেত হইয়া বসিয়াছেন দেবতারা এক স্থানে। প্রত্যেকেই করিতেছেন আত্মম্ভরিতা। তখন অদূরে দেখিলেন তাঁহারা এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বস্তু। অগ্নিকে আদেশ করিলেন ইন্দ্র "যাও তো অগ্নি, জেনে এসো ঐ জ্যোতির্ম্ময় বস্তুটি কি বা কে ?"

"আপনি কে ?" নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অগ্নি। উত্তরের বদলে আসিল প্রতি জিজ্ঞাসা "আপনি কে ?" "অগ্নি আমি" উত্তর করিলেন অগ্নি। "কী কার্য্য করিতে পারেন আপনি ?' প্রশ্ন করিলেন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। "ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারি আমি" গর্ব্বিত কণ্ঠে জবাব দিলেন জাতবেদা।

'বটে, তবে দগ্ধ কর এই তৃণগাছি।" অগ্নির সম্মুখে একগাছি ক্ষুদ্র তৃণ রাখিয়া এই কথা বলিলেন জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন বহ্নি দেবতা। কিন্তু কী আশ্চর্য্য ! সবখানি শক্তি প্রয়োগ করিয়াও সক্ষম হইলেন না তুচ্ছ তৃণখণ্ড দগ্ধীভূত করিতে। ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন অহংকারী অগ্নি দেবতা।

অগ্নি ফিরিল না দেখিয়া বায়ুকে আদেশ করিলেন দেবরাজ জ্যোতির্ম্ময় দেবতার পরিচয় জানিতে। চলিলেন পবন দেব। 'আপনি কে ?" পবনের প্রশ্নে, প্রতি প্রশ্ন আসিল "আপনি কে ?" "বায়ু দেবতা আমি।" জবাব দিলেন বায়ু। "কী করিতে পারেন আপনি ?" মুরুব্বি সুরে সুধাইলেন জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ। "যা কিছু আছে বিশ্বে উড়াইয়া ফেলিতে পারি সব" গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে উত্তর দেন সদাগতি। "বটে, তবে এই তৃণগাছি উড়াও"

বলিয়া একগাছি তৃণ রাখিলেন বায়ু-দেবতার সমীপে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন পবনদেব। প্রয়োগ করিলেন সবখানি তাঁহার সামর্থ্য কিন্তু পারিলেন না একটুও সরাইতে তৃণ খণ্ডটিকে। চূর্ণিত গর্ব্ব পবনদেব ভয়ে বিস্ময়ে পলায়নপর হইলেন। দুই বীর পুরুষ ভঙ্গ দিলেন রণে দেখিয়া অগ্রসর হইলেন দেবরাজ স্বয়ং। মনে গর্ব্ব হাতের মুঠোয় ধরিয়া ফেলিবেন জ্যোতির্ম্ময় দেবতাকে। কিন্তু সম্ভব হইল না তাহা কোনমতেই।

জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ অন্তর্হিত হইলেন দেবরাজ নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেই। হতবাক ইন্দ্র চাহিলেন ঊর্দ্ধদিকে। বিস্ময়ে দেখিলেন ব্রহ্মচারিণী উমা হৈমবতীকে। তিনি তখন কৃপা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন ইন্দ্রকে।

ব্রহ্মচারিণী বুঝাইয়া দিলেন ইন্দ্রকে ব্রহ্মের তত্ত্বটি। সংসারে কাহারো ক্ষমতা নাই কোনও কার্য্য করিতে। সকল শক্তির উৎস পরব্রহ্ম। তিনিই উদিত হইয়াছিলেন গর্ব্বিত দেবতাগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিতে। ব্রহ্মচারিণী ঐ দেবী মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মজ্ঞান। তাঁহার দর্শনে ও কৃপাবর্ষণে ইন্দ্রের হইয়াছিল সত্যস্বরূপ ব্রহ্মানুভূতি।

চণ্ডঘণ্টা

মহিষাসুর বধের জন্য প্রকটিতা হন মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী দুর্গা-দেবী নিখিল দেবগণের অঙ্গজ্যোতি অবলম্বনে। দেবীর হাতে অস্ত্রোপহার দিলেন দেবতাগণ নিজ নিজ অস্ত্র হইতে অপর একটি

অস্ত্র প্রকাশ করিয়া। ঘণ্টা দিলেন দেবরাজ ইন্দ্র বুঝি বা যে ব্রহ্মজ্ঞান নিজে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন উহা বিশ্বে বিঘোষণা করিবার জন্য। ঐ ঘণ্টার মধ্যে গজরাজ ঐরাবতের মহাশক্তি "দদৌ তস্যৈ সহস্রাক্ষো ঘণ্টামৈরাবতাদ্‌গজাৎ" অতি প্রচণ্ড তাই ঐ ঘণ্টার ধ্বনি। পণ্ডিতেরা বলেন ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী। সকল বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির সমষ্টি হইলেন ঘণ্টা। মহাবিশ্বের মূলে যে শব্দ-ব্রহ্ম বা নাদ-ব্রহ্ম তাই ঐ মহা ঘণ্টার ধ্বনি হইতেই উদ্ভূত। যখন সাধনপথে অগ্রসর হন সাধকেরা মায়ের দিকে তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন দেবীর নিকটবর্ত্তিতা ঐ ঘণ্টারবের মাধ্যমে। যাহারা ভোগাসক্ত তাহারাও মৃত্যুকালে ঐ ধ্বনি শোনে—ভয়ে কাঁপে যমবাহন মহিষের গলঘণ্টা ভাবিয়া। যাঁহারা মাতৃসেবাসক্ত তাঁহারা শুনেন ধ্বনি মাতৃকরস্থিত ঘণ্টার মঙ্গল আহ্বানরূপে। উল্লাসে তাঁহারা আনন্দে মাতিয়া উঠেন। ভোগীরা কম্পমান দেহে যায় নিরয়ে, যোগীরা চণ্ডঘণ্টা জননীর ধ্বনি অনুসারে ধায় শান্তিময় অঙ্কে।

কুষ্মাণ্ডা

নবদুর্গার চতুর্থ মূর্ত্তি কুষ্মাণ্ডা। উষ্মা শব্দে বুঝায় তাপ। কুৎসিত তাপের নাম কুষ্মা। এই মরণশীল জগতে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক ভেদে ত্রিবিধ তাপ। এই দুর্ব্বিষহ ত্রিতাপই কুষ্মা। অণ্ড শব্দে উদর। কুষ্মা বহন করেন যিনি উদরে তিনিই কুষ্মাণ্ডা।

শ্রীকৃষ্ণ পান করিয়াছিলেন দাবানল, ব্রজের ভক্তদের রক্ষার

জন্য। জননী উদরস্থ করেন ত্রিতাপ পদাশ্রিত জনকে শান্তি দিতে। যারা আশ্রয় করে না অভয়ার পদ তারা প্রতিনিয়ত জ্বলে তাপে। আর যাঁরা করেন আত্মার্পণ ঐ রাঙ্গা পদে তাদের কু কাম কালিমা ও তাপত্রয় আপনি উদরস্থ করেন জননী। লাভ করেন তাঁরা পরা শান্তি মায়ের শান্তিপ্রদ অঙ্কদেশে। কুষ্মাণ্ডা সন্তান তাপহারিণী কল্যাণময়ী জননী।

স্কন্দমাতা

দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়ের অপর নাম স্কন্দ। ইহার জন্মের উপক্রমণিকা শৈলপুত্রী পরিচয়ে বলা হইয়াছে। দেবতাদের প্রার্থনায় উমা রূপে জন্মিয়াছেন মহাদেবী হিমালয়ের ঘরে মেনকাদেবীর অঙ্কে। উমা যখন কৈশোরে পা দিয়াছেন তখন একদা দেবতাদের পরামর্শে কামদেবকে লইয়া গেলেন শিবের ধ্যান ভাঙ্গিতে। ফুলের ধনু তুলিতে না তুলিতে মদনদেব ভস্মীভূত হইয়া গেলেন মহারুদ্রের ক্রোধাগ্নিতে। পার্ব্বতী বুঝিলেন নিজের ভুল। বুঝিলেন কামদেবের সহায়তায় শিবকে টলাইবার চেষ্টা নিছক বিড়ম্বনা।

সাধনা চাই শিবকে পাইতে। তপস্যা চাই শিবপ্রিয়া হইতে। মহাতপস্যায় চলিলেন পর্ব্বত-কন্যা। 'উমা, উমা যেওনা যেওনা' বলিয়া স্নেহময়ী মা মেনকা নিষেধ করিলেন কত। তবু গেলেন দেবী সুকঠোর তপস্যাচরণে। শ্রেষ্ঠ তপস্বীরাও বৃক্ষের গলিত পত্র খান, পার্ব্বতী তাহাও ছাড়িলেন—তাই ঋষিরা নাম দিলেন অপর্ণা।

শক্তির ধ্যানে আছেন শিব, আজ শিবের ধ্যানে বসিলেন শক্তি! ধ্যানের ফলে ঘটিল দুজনার মহামিলন। জন্মিলেন কুমার কার্ত্তিকেয়। ইনিই দেব-সেনানায়ক স্কন্দ। স্কন্দের গৌরব মদনদহন পিতা ও অর্পণা মাতার সন্তান। দেবীরও গৌরব স্কন্দ হেন পুত্রের জন্মদাত্রী তিনি। আমাদেরও গৌরব স্কন্দ আমাদের ভাই। মা আমাদের স্কন্দমাতা।

কাত্যায়নী

সতীর মহাদেহ মহাদেবের স্কন্দে। তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলেন বিষ্ণু নিজ সুদর্শন চক্রে। সারা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িল মহাদেহের একান্নটি অংশ। তাহাতে হইল একান্ন পীঠ-স্থান। এক এক পীঠস্থানে এক এক মূর্তিতে আছেন মহাদেবী।

বৃন্দাবন এক মহাপীঠ। দেবী বিরাজিত সেখানে কাত্যায়নী-রূপে। কাত্যায়নী দেবীর একটি কার্য্য আছে অনন্য সাধারণ। সেটি হইল সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তি দান। চণ্ডীতে দেবীর সুখদা ও মোক্ষদা দুইটি স্বরূপের কথা সুস্পষ্ট। সুরথ রাজাকে দিলেন সুখ, সমাধি বৈশ্যকে দিলেন মোক্ষ। কাত্যায়নী-রূপে দেবী ভক্তিদা।

ভক্তি ধন অতীব দুষ্প্রাপ্য বস্তু। ইহা সাধনলব্ধ বস্তু নহে। কোন সাধনাতেই ভক্তি-সম্পত্তি লাভ করা যায় না। উহা একমাত্র কৃপালব্ধ সামগ্রী। কাত্যায়নী-রূপিণী যোগমায়া দেবীর করুণায় উহা লাভ হয়। তবে যাকে তাকে উহা দেন না দেবী। যারা সুখ ও মোক্ষকে অত্যন্ত ভাবে তুচ্ছ করিতে পারে, কাম্য

যাদের আর কিছুই নাই কৃষ্ণসেবা ছাড়া কাতায়নী দেবী দান করেন তাদের প্রেম মহাসম্পদ।

ব্রজের গোপবালারা এই কাত্যায়নী দেবীর কাছেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন নন্দ-নন্দনকে পতিরূপে পাইবার জন্য। তাদের প্রার্থনার মন্ত্র ভাগবতে দৃষ্ট হয়—

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিণ্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

হে দেবি কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে দুর্ঘটনঘটনসমর্থে! হে অধীশ্বরি! হে ক্রীড়ারসাভিজ্ঞে! নন্দ-গোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দেন আপনি। প্রণাম করি আমরা আপনার পাদপদ্মে।

গোপকুমারিগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া দেবী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ফলও পাইয়াছিলেন। কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করা জননীর একটি প্রধান কার্য্য। এই কার্য্য প্রধানতঃ কাত্যায়নী-রূপিণী মহাদেবীর।

কালরাত্রি

কালরাত্রি দুর্গার একটি স্বরূপ ও নাম। এমন নামের কারণ আছে অবশ্যই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্তের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। ঐ সূক্তে ফলতঃ পরমাত্মাকেই বলা হইয়াছে রাত্রি। পরব্রহ্মই রাত্রি। ব্রহ্মময়ী মা ঐ রাত্রিরই শক্তি।

রাত্রিতে জীবজগতের বিরতি হয় সর্ব্বকার্য্য হইতে। বিশ্রাম লাভ করে সকলে। সকল কর্ম্মক্লান্তি যায় ঘুচিয়া। প্রলয় কালে এই রাত্রিরূপিণী মাতৃ-ক্রোড়ে বিলয় ঘটে সর্ব্ব বিশ্বের। মায়ের অঙ্কে বিশ্রাম লয় নিখিল জীবনিবহ। মহাপ্রলয়ের রাত্রিই মহারাত্রি। দেবী এই রাত্রিরূপা। মহারাত্রি হইতে কালরাত্রি গভীরতরা। মহারাত্রিতে সংসার লয় হয়। কিন্তু পরমপুরুষ মহাবিষ্ণু জাগিয়া থাকেন। কালরত্রিতে মহাবিষ্ণু ঘুমাইয়া পড়েন। অনন্তের অনন্ত শয্যা বিস্তার করিয়া ঘুমন্ত ভগবান কী করেন। চণ্ডী বলেন যোগনিদ্রাকে ভজন করেন।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥

এই যোগনিদ্রাই মহাকালিকা বা কালরাত্রি। প্রত্যহ প্রত্যেক মানুষ যার কোলে বিশ্রাম লয় দিবাবসানে কর্ম্মক্লান্তির পর, আবার প্রভাতে উত্থিত হয় যাহার কোল হইতে নূতন উত্তম লইয়া তিনি কালরাত্রির দেবীর অংশভূতা কুণ্ডলিনী কালিকা।

বিশ্ব, বিশ্বজীবকে, বিশ্বনাথকে ও কালশক্তিকে যিনি স্তব্ধ করেন তিনি কালরাত্রি দেবী।

মহাগৌরী

দেবাদিদেব একদিন কালরাত্রি দেবীকে করিলেন উপহাস কালো মেয়ে বলিয়া। দেবী অভিমানিনী হইয়া নিযুক্ত হইলেন কঠিন তপস্যায়।

তপস্যা করিয়া নিজের কালো বরণ দিলেন ভর্ত্তাকে। আর

নিজে হইলেন গৌরী। শুধু গৌরী নহেন, মহাগৌরী বিদ্যুদ্বরণী। দেবাদিদেব হইলেন নারায়ণ—দেবী হইলেন শ্রীলক্ষ্মী। চরণতলে বসিলেন সেবায়। মহাকালী ছিলেন সন্তানবৎসলা, মহাগৌরী হইলেন স্বামী সোহাগিনী।

শক্তি শক্তিমানে অনন্ত লীলা-বৈচিত্র্য। কত রূপে যে কত খেলা খেলেন কে করিবে তার ইয়ত্তা। অবুঝ জীব দ্বন্দ্ব করে—তত্ত্বরসিক যাঁরা তাঁরা তাহা উপভোগ করেন।

সিদ্ধিদাত্রী

সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিদান করেন যিনি সাধককে তিনি সিদ্ধিদাত্রী। পূর্ব্ববর্ত্তী আটটি নামের মধ্যে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন শ্রীভগবান।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে।
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥

যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। এই তুষ্টকারিণী শক্তিই সিদ্ধিদাত্রী জননী।

গীতা বা মহাভারতের উপনিষদ্ পর্ব্বাধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে ভীষ্ম পর্ব্বের পঞ্চবিংশতম অধ্যায় হইতে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রয়োবিংশতিতম (২৩) অধ্যায়ের নাম দুর্গাস্তব পর্ব্বাধ্যায়। অধ্যায় প্রারম্ভেই শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি মা দুর্গার স্তব কর যুদ্ধে জয়ের জন্য। এই স্তবটি এই গ্রন্থের প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। যে-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ স্তব করিতে আদেশ করিলেন তিনি সিদ্ধিদাত্রীস্বরূপিণী। অর্জ্জুনের স্তবে

তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছিলেন সিদ্ধিদাত্রী জননী মূর্ত্তিস্বরূপে। কেবল দেখা নহে অন্তর ভরা আশিসও দিয়াছিলেন মা সন্তানকে। বিশ্বের সকল জীব যোগী, ভোগী, ত্যাগী, সাধক, ভক্ত, গৃহী, বনী, তপস্বী এমন কি ব্রহ্মা, শিব পর্য্যন্ত সাধনরত। কোনও না কোন কার্য্যে সিদ্ধি তাঁরা পান এই সিদ্ধিদাত্রী দেবীর করুণায়।

সংসারের সকল জীবের মঙ্গলকর কার্য্যে দেবী সিদ্ধিদাত্রী দান করেন পূর্ণ সিদ্ধি। সুরথ চাহিয়াছিলেন সুখ, সমাধি চাহিয়াছেন মোক্ষ, গোপীরা চাহিয়াছেন কৃষ্ণপতি, শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু চাহিয়াছেন প্রেমসুধা, জগজ্জীবকে বিতরণের তরে। মাকেই বলিয়াছেন বিতরণের ভার নিতে—এ অদ্ভুত প্রার্থনা—

"এস হে ওহে পাগলা কালী
লয়ে প্রেমের ডালি।"

নবপত্রিকা

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"

শ্রীশ্রী চণ্ডীগ্রন্থের একটি মূলমন্ত্র। সর্বভূতে আছেন মহাশক্তি মাতৃরূপে ; 'সর্বভূতে' কথাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। কেবল যে তোমার আমার মায়ের মধ্যেই মাতৃরূপে আছেন তাহা নহে। সর্বভূতেই মাতৃরূপে আছেন। বৃক্ষলতা, পশুপাখী, স্থাবর-জঙ্গম সকল বস্তুতেই মাতৃরূপিণী বিরাজমানা আছেন। নবপত্রিকার কতিপয় বৃক্ষের চারাগাছের মধ্যে মাতৃত্বের দর্শন আর্য্যঋষিগণের গভীর দার্শনিকতার নিদর্শন।

নবপত্রিকা বলিতে নয়টি গাছের চারা বুঝায়। সমষ্টিগত ভাবে ইহারা মহাশক্তি মা দুর্গার প্রতিনিধি। শারদীয়া পূজার সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা স্থাপন করিতে হয়। কদলী, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বেল, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান এই নয়টি গাছের চারাকে শ্বেত অপরাজিতা লতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া কলা-বৌ সাজাইয়া পূজা হয়। মা দুর্গার প্রতিভূ স্বরূপ ইহাদের অর্চনা।

রম্ভা কচ্চী হরিদ্রা চ জয়ন্তী বিল্বদাড়িমৌ।
অশোকা মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা॥

প্রত্যেকটি চারার এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। কদলীতে আছেন অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ব্রহ্মাণী, কচুতে কালিকা, হরিদ্রাতে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিকী। বেলের অধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা। অশোকের দেবী শোকরহিতা, মানের

চামুণ্ডা, ধানের লক্ষ্মী। ইহারা প্রত্যেকেই ভগবতী দুর্গার বিভিন্ন মূর্তি। সমষ্টিগত ভাবে ইহাদিগকে নবদুর্গা বলে। দেবী কবচে অপর এক নবদুর্গার কথা আছে। "প্রথমং শৈলপুত্রী চ" ইত্যাদি। সেই নবদুর্গার নাম ও কার্য্য অন্যরূপ।

ব্রহ্মাণী কদলী কাণ্ডে দাড়িমে রক্ত দন্তিকা
ধান্যে লক্ষ্মী হরিদ্রায়াং দুর্গা মানবপত্রকে।
চামুণ্ডা, কালিকা, কচ্চ্যাং শিবা বিল্বে প্রতিষ্ঠিতা
অশোকে শোকরহিতা জয়ন্ত্যাং কার্ত্তিকীং স্মৃতি॥

একই বীজে পৃথক পৃথক মন্ত্রে ইহাদিগকে পৃথক পৃথক অর্চনা করিতে হয়। রম্ভাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণীকে বলিতে হইবে—

দেবী! তুমি কদলী বৃক্ষে অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছ। মূলে তুমি বিষ্ণুবক্ষ-বিলাসিনী। বিষ্ণু পালিনী শক্তির মূল। বিষ্ণুর বক্ষে যে পালিনী শক্তি সেই শক্তি রহিয়াছে কদলীবৃক্ষে। নবপত্রিকারূপে বিরাজমানা আজ তুমি। তুমি চণ্ডনায়িকা, তুমি দুর্গাদেবী। তুমি পূজার সমীপস্থ হও। কদলীরূপে সর্ব্বত্র শান্তি বিধান কর। (রম্ভা-রূপেণ সর্ব্বত্র শান্তিং কুরু নমোঽস্তু তে)।

কচুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকাকে বলিতে হয়—দেবী কালিকে, তুমি সর্ব-সিদ্ধি প্রদায়িনী উদ্ভিদরূপে স্থিতা। তুমি স্নানের দ্বারা নির্মল হও। দুর্গা রূপে সর্ব্বত্র বিজয় কর তুমি। মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে তুমি কচ্চী হইয়া সাহায্য করিয়াছ। (মহিষাসুর যুদ্ধের কচ্চী ভূতানি সুব্রতে)। আজ তুমি অসিয়াছ হে হরপ্রিয়ে, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াই আসিয়াছ। (মম চানুগ্রহার্থায় আগতোঽসি হরপ্রিয়ে)

হরিদ্রা বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। স্তব করিয়া তাহাকে ভক্ত বলেন, হে হরিদ্রে, তুমি শঙ্কর প্রিয়ে। তুমিই রুদ্ররূপে, শ্রীরূপে সর্ববিধ শান্তি বিধান কর (সর্ব শান্তিং প্রযচ্ছ মে)।

তুমি দেবী হররূপা, উমারূপা, এই পূজা গ্রহণ কর, আমাদিগের বিঘ্ন বিনাশ কর (বিঘ্ন বিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ)। প্রসন্না হও, দেবি।

জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্ত্তিকীকে বলিতে হয়—হে জগতের জয়দাত্রী, তুমি আমার গৃহে জয় দাও (জয়ং দেহি গৃহে মম)। নিশুম্ভ-শুম্ভ বিনাশকারিণী তুমি (নিশুম্ভ-শুম্ভ মথনে)। হে দেবি কার্ত্তিকে, বরদায়িনী হও (বরদা ভব)।

বিল্ববৃক্ষকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে হয়, হে বিল্ব, তুমি শ্রীফল, তুমি সৌন্দর্য্যের নিকেতন স্বরূপ, তুমি সর্ব্বদা বিজয় বর্দ্ধন করিয়া থাক (সদা বিজয় বর্দ্ধন)। হে বিল্ব, তুমি মহাদেব, বাসুদেব ও উমা, ইহাদের প্রিয়কর। হে বিল্বাধিষ্ঠাত্রী শিবা দেবী, তোমায় নমস্কার করি।

দাড়িম্ব বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্তদন্তিকাকে বলিতে হয়—হে মাতঃ, তোমার দন্তপংক্তি পক্ক দাড়িম্বের বীজের মত সুন্দর। এই জগজ্জীবের অঘ এবং ক্ষুধা বিনাশ করিবার জন্যই তুমি প্রকাশিত হইয়াছে (অঘ নাশায় ক্ষুন্নাশায়)। যুদ্ধকালে তুমি রক্তবীজের সম্মুখে উমার কার্য্য করিয়াছিলে (রক্তবীজস্য সম্মুখে উমাকার্য্যং কৃতং)। প্রসন্ন হইয়া আমাদের বরদায়িনী হও।

অশোকাধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতাকে স্তব করিতে হয়,

তুমি আমাদের হৃদয়ে স্থির হও (স্থিরা ভব)। তুমি শিব-দুর্গার প্রীতিকর। তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদা শোকরহিত কর (অশোকং সদা কুরু)।

মানবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডাকে বলিতে হয়—দেবি, মান্য বৃক্ষগণের মধ্যে তুমি সুরাসুর কর্ত্তৃক মাননীয় (মান্যেষু বৃক্ষেষু মাননীয়ঃ সুরাসুরৈঃ)। তোমাতে যে চামুণ্ডা দেবী বিরাজমানা তাঁহাকে আমরা স্নান করাইতেছি। আমাদিগকে মান দেও (মানং দেহী)। মানপত্র শচী দেবীর প্রিয়। পত্রে তিনি বাস করেন। কৃপা করিয়া আমাদের পূজা লও। দেবি চামুণ্ডে, তোমাকে প্রণাম করি।

ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে নমস্কার করিয়া বলিতে হয়—ধান্যরূপা দেবী, জগতের মঙ্গলের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ব্রহ্মা (জগতঃ প্রাণ রক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতা পুরা)। তুমি দেবী উমার প্রীতিদায়িকা। আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর (রক্ষ মাং সদা)। দেবী লক্ষ্মী, তোমার চরণে প্রণতা হই।

মন্ত্রের মধ্যের সকল কথার তাৎপর্য্যানুশীলন করা কঠিন। মহিষাসুর যুদ্ধে কালিকাদেবী কচু হইয়া সহায়তা করিয়াছেন। রক্তবীজের যুদ্ধকালে রক্তদন্তিকা উমার কার্য্য করিয়াছিলেন—এই সকল কথার অর্থ নির্ণয় করা সুকঠিন। দেবী নিখিল দেবগণের শক্তিসমূহের ঘনীভূত মূর্ত্তি। অসুরসঙ্গে যুদ্ধকালে উদ্ভিদগণ, তরুলতাগণ কে কি ভাবে সাহায্য করিয়াছে তাহা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণই জানেন।

উদ্ভিদজগতে মাতৃরূপে থাকিয়া দেবী আমাদিগের নিত্য

জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের সহায়ক হন। নবপত্রিকা উদ্ভিদ জগতের প্রতিনিধি। মা দুর্গার প্রতীক। কোন কোন দেশে কেবল মাত্র এই প্রতীকেই অর্চ্চনা হয়। নিখিল বিশ্বের উদ্ভিদে মহা মাতৃকা-রূপে-স্থিতা জগন্মাতাকে নবপত্রিকার মাধ্যমে আমরা প্রণাম জানাইয়া প্রার্থনা করি—মা! বাঙ্গালীর বাহুতে আবার বল দাও।

দশ-মহাবিদ্যা

বিশ্ব-স্রষ্টৃদের যজ্ঞ। বিরাট ব্যাপার। সকল দেবগণ ঋষিগণ সমুপস্থিত। সভাস্থল পরিপূর্ণ। এমন সময় আসিলেন দক্ষ-প্রজাপতি। অভিবাদন করিলেন তাঁহাকে সকল দেবতাগণ, মুনি-ঋষিগণ সকলেই দাঁড়াইয়া সম্বর্ধনা জানাইলেন। কেবল দাঁড়াইলেন না ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন জন। দক্ষ ভাবিলেন ব্রহ্মা আমার পিতৃদেব, বিষ্ণু ত্রিজগতের পালন কর্তা। ইঁহারা না দাঁড়াইয়া ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু শিব দাঁড়াইল না কেন? সে হইল আমার কন্যা সতীর বর। শ্বশুরকে দেখিয়া জামাতা সম্মান করিবে না? কুপিত হইলেন দক্ষ প্রজাপতি নিজেকে অসম্মানিত মনে করিয়া। শিবকে নিন্দা করিলেন ক্রুদ্ধ হইয়া। কিন্তু হীন ক্রোধ তাহাতেও দূর হইল না।

গৃহে ফিরিয়া এক বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করিলেন দক্ষ-প্রজাপতি। ত্রিলোকের সকলের নিমন্ত্রণ হইল। বাকী রহিল শুধু শিব আর সতী। বাপের বাড়ী যজ্ঞের কথা শুনিয়া সতী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন যাইবার জন্য। শিব নিষেধ করিলেন। শিব বলিলেন 'বিনা নিমন্ত্রণে কোথাও যাওয়া উচিত নয়।' সতী বলিলেন 'বাপের বাড়ী যাইতে মেয়ের আবার নিমন্ত্রণ কি ? তুমি না হয় না গেলে।' মহাদেব এ যুক্তি মানিলেন না। তিনি সতীকে পিত্রালয় যাইতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন।

সতী প্রথমে দুঃখিতা হইয়া কাঁদিলেন। তারপর ক্রোধে হইলেন অগ্নিমূর্তি। ভয়ানকভাবে অট্টহাস্য করিলেন। ভীষণা মূর্তি দেখিয়া দেবদেব মহাভীত হইয়া পলায়নপর হইলেন। কিন্তু পালাইবেন কোন্ দিকে ? দেববর যেদিকে পলায়ন করিতে যান, সেই দিকেই এক এক অভিনব ভীষণা মূর্তি ধরিয়া দাঁড়ান দেবী। দশদিকে দশ-মূর্তি। শিব দিশাহারা—স্তব্ধ। ভীতিবিহ্বল সুরে কহিলেন শঙ্কর, "তোমরা কাহারা ? আমার সতী কোথায় গেল ?"

একমূর্তি উত্তর করিলেন—"আমি তোমার সতী, এই যে ভীষণা দশমূর্তি এসকল আমারই বিভিন্ন প্রকাশ। হে শম্ভো, ভয় পাইওনা।"

দশদিক্ষু মহাভীমা যা এতা দশমূর্তয়ঃ।
সর্বা মমৈব মা শম্ভো ভয়ং কুরু মহামতে॥

শিব বলিলেন „ তুমিই যদি সতী তাহা হইলে এমন কৃষ্ণবর্ণা

কেন ? এমন ভয়প্রদা কেন ? সতী বলিলেন, "আমি সতীই, তবে এখন ভৈরবী মূর্তি ধারণ করিয়াছি।"

"তোমার সম্মুখভাগে এই দেখ আমিই রহিয়াছি কালী মূর্তিতে। তোমার উর্দ্ধদেশে এই যে আমিই আছি মহাকাল স্বরূপিণী তারারূপে। তোমার ডান দিকে আমি আছি ছিন্নমস্তকা ছিন্নমস্তারূপে। বামে রহিয়াছি ভুবনেশ্বরীরূপে। শত্রুনাশিনী বগলা রূপে এই দেখ রহিয়াছি তোমার পশ্চাতে। অগ্নিকোণে আছি বিধবারূপিণী ধূমাবতীরূপে। নৈঋত কোণে রহিয়াছি ত্রিপুরাসুন্দরী কমলারূপে। বায়ু কোণে আছি আমি মাতঙ্গীরূপে। ঈশান কোণে আমিই বিদ্যমান মহেশ্বরী ষোড়শী-রূপে। আর তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি এই আমি ভীমা ভৈরবীরূপে।"

একই বিশ্বজননীর এই দশবিধ মূর্তির নাম দশমহাবিদ্যা। সিদ্ধবিদ্যাও বলে। মূলতঃ ইঁহারা সকলেই এক। বিন্দুমাত্র পৃথক বোধ করিলে অপরাধ হয়। ইঁহাদের নাম সাধারণতঃ এই-ভাবে প্রচলিত। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতীস্তথা। বগলা সিদ্ধিবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা এতা দশমহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতাঃ।

কালী মহামেঘ বরণা। শবারূঢ়া। খড়গ মুণ্ড বরাভয় ধারিণী চতুর্ভুজা। সর্বপ্রাণীকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন যিনি তিনি মহাকাল। সেই মহাকালকেও কলন বা গ্রাস করেন যিনি তিনি কালিকা।

কলনাৎ সর্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্তিতঃ।
মহাকলস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥

তারানাম্নী মহাবিদ্যা। জীবকে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া দেন বলিয়া নাম তারা। তারয়তীতি। ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া অপর নাম উগ্রতারা। ইনি নীলবর্ণা। একজটা ত্রিনয়না। শিবোপরি আরূঢ়া। ইনি-বাক্ শক্তি প্রদান করেন বলিয়া অপর নাম নীলসরস্বতী। ইনি সুখ-মোক্ষ-প্রদায়িনী। ইনি ভয়ঙ্করী কিন্তু বরদা। ষোড়শী মহাবিদ্যা। ইহার অপর নাম শ্রীবিদ্যা। 'শ্রী'দান করেন বলিয়া এই নাম। ইনি রাজরাজেশ্বরী নামেও খ্যাতা। ইনি রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা। ইনি কুঙ্কুমের মত অরুণ বর্ণা। ইহার বদনে সতত সংলগ্ন মধুরিম হাসি। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ঈশ্বর এই চারিজন ষোড়শীদেবীর পর্যঙ্কের চারিপাদ রূপে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বরী মহাবিদ্যা। ইনি সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণা। পাশ অঙ্কুশ ও বরাভয় শোভিতা। 'ভুবনানাং পালকত্বং' এই হেতু ভুবনেশ্বরী সার্থক নাম। ইনি দ্বিভুজা। এক হস্তে পান-পাত্র অপর হস্তে রক্ত-পদ্ম ধারিণী। (রূপভেদে চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী দেবীও দৃষ্ট হন)। ইনি ত্রিনয়না। রক্ত-পদ্মোপরি আসীনা।

ভৈরবী মহাবিদ্যা। ইনি রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা। কালভৈরবের ভার্যা বলিয়া ভৈরবী নামে বিখ্যাতা। ইনি জীবের যমদুঃখ নাশ করেন। চতুর্ভুজা দেবীর দুই করে জপমালা ও পুঁথি, অপর দুই করে বরাভয় মুদ্রা। উদীয়মান সূর্যের মত দেবীর দেহকান্তি। ললাটের ওপর অর্ধচন্দ্র বিরাজিত।

ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা। ইনি কোকনদ বরণা দ্বিভুজা, দিগম্বরী নিজহাতে নিজমুণ্ড কাটিয়া করতলে ধারণ করিয়াছেন। এক হাতে অসি অপর হাতে নিজমুণ্ড! কণ্ঠ হইতে দিনরাত রুধির উঠিতেছে। এক ধারা নিজ মুখে, অপর দুই ধারা দুই পার্শ্বস্থ ডাকিনী বর্ণিনী নামা দুই সখী পান করিতেছে। বিপরীত ভাবে রতিরতা কামদেবের ওপর ইনি দণ্ডায়মানা। ইনি অস্থিমালা ধারিণী। এক সর্পকে যজ্ঞোপবীত রূপে ধারণ করিয়াছেন। ইনি মহাভয়ঙ্করী। মস্তক ছিন্ন বলিয়াই ছিন্নমস্তা নামে প্রসিদ্ধা। ধূমাবতী মহাবিদ্যা। অতি বৃদ্ধা, বিধবা, ধূম্রবর্ণা দেবী। ইনি বিস্তারবদনা ক্ষুধাকাতরা। দ্বিভুজা। এক হস্ত কম্পমান, অপর হস্তে কুলা। ধূম্রাসুরকে বধ করিয়া নাম ধরিয়াছেন ধূমাবতী। ইহার দেহভঙ্গী কুটীল, দৃষ্টিও কুটীল। ইনি ভয়প্রদা, রুক্ষা ও কলহপ্রিয়া।

বগলামুখী মহাবিদ্যা। ইনি পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা। ব-কারে বারুণী দেবী, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী, ল-কারে পৃথিবী। ইহাই ইঁহার নামের নির্বাচন। ইনি এক হস্তে মুদ্গর ও অপর হস্তে অসুরের জিহ্বা টানিয়া ধরিয়াছেন। বগলামুখীর মন্ত্র স্মরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। পবনের গতিও স্থগিত হয়, অগ্নিও শীতল হয়। গর্বিতের গর্ব যায়, ক্ষিতিপতি শঙ্কিত হয়।

মাতঙ্গী মহাবিদ্যা। ইনি শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা ত্রিলোচনা। ললাটফলকে অর্ধচন্দ্রধারিণী। ইনি সদা হাস্যময়ী। ইঁহাকে আরাধনা করিলে শ্রীলাভ হয়। মতঙ্গাসুর বধ করিয়া নাম ধরিয়াছেন মাতঙ্গী। ইনি অঙ্কুশ, অসি, পাশ ও খেটকধারিণী।

কমলাত্মিকা মহাবিদ্যা। ইনি স্বর্ণবৎ সমুজ্জ্বলা। শ্বেতবর্ণ চারিটি হস্তী শুণ্ড দ্বারা অমৃতপূর্ণ চারিটি স্বর্ণকুম্ভ গ্রহণ করিয়া কমলাদেবীকে অভিষেক করিতেছেন, ইহার পরিধানে পট্টবস্ত্র। পদ্মোপরি অবস্থিতা। ইনি বৈকুণ্ঠে কমলা, পাতালে লক্ষ্মীরূপা। ইনি কখনও দ্বিভুজা, কখনও চতুর্ভুজা, কখনও ষড়ভুজা, কখনও বা অষ্টভুজা রূপে বিদ্যমান আছেন।

কামরূপ কামাখ্যায় দশমহাবিদ্যার মন্দির আছে। এই দশমূর্তি মূলতঃ একই। ইঁহাদের মধ্যে যাহার মনে ভেদবুদ্ধি থাকে সে নরকাগ্নিতে পচিবে। সম্পূর্ণভাবে ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধনা করিতে হইবে। লীলাভেদে বিভিন্ন-রূপ ধারণ করিলেও তত্ত্বতঃ ইঁহারা এক এবং অভিন্ন এই জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াই সাধক সিদ্ধিলাভ করেন।

অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়েন্নরঃ।
ত্রিলোকে স তু সম্পূজ্য স্যাৎ তাবাস্তুত এব সঃ॥

দশমহাবিদ্যার নাম উচ্চারণে সর্ব-পাপ দূরীভূত হয়। ইঁহাদের স্মরণে জীব ভববন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করে।

একোচ্চারণ মাত্রেণ সর্ব পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
স্মরণেনৈব দেবেশি মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥

শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তুতি চতুষ্টয়

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত তেরটি (৮১শ হতে ৯৩শতম) অধ্যায়ে দেবী মাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১৩টি অধ্যায়ে সাত শত মন্ত্র। এইজন্য ইহাকে সপ্তশতী বলা হয়। চণ্ডীতে তিনটি চরিত আছে। প্রথম চরিতে মধুকৈটভ বধ। ব্রহ্মার আরাধনায় যোগনিদ্রারূপিণী মহাকালী আবির্ভূতা হইলেন। বিষ্ণু মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়কে বধ করেন। মধ্যচরিতে মহিষাসুর বধ। কোপিত বিষ্ণুর মুখ হইতে তেজ নির্গত হয়। তৎপর অন্যান্য দেবতার শরীর হইতেও তেজ নির্গত হয়। সেই তেজসমষ্টি হইতে মহালক্ষ্মী আবির্ভূতা হইয়া মহিসাসুরকে বধ করেন। এই মহালক্ষ্মী দুর্গানামে শরৎকালে অর্চিতা হন। উত্তর চরিতে শুম্ভনিশুম্ভ বধ। দেবী কৌশিকী মূর্তিতে আবির্ভূতা হন, ইঁহারই নামান্তর মহাসরস্বতী। ইনি ধূম্রলোচন, রক্তবীজ ও শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করেন।

চণ্ডী গ্রন্থে তিন প্রকারের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ঘটনার বর্ণনা, যুদ্ধের বর্ণনা ও স্তবস্তুতি।

এই স্তবস্তুতিগুলির বিষয় আলোচিত হইতেছে। চণ্ডীগ্রন্থে মোট চারিটি স্তুতি আছে। প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মাকৃত দেবীস্তুতি। এই স্তুতিকে বিশ্বেশ্বরী স্তুতি বলে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণ কর্তৃক মহিষাসুর বধানন্তর উল্লাসপূর্ণ এক স্তুতি। ইহাকে মহিষহন্ত্রী স্তুতি বলা হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে পুনরায় দেবগণ কর্তৃক দেবী স্তুতি—শুম্ভনিশুম্ভ বধার্থ। ইহাকে দেবীসূক্ত বলা হয়।

একাদশ অধ্যায়ে দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তব শুম্ভনিশুম্ভ বধানন্তর দেবগণের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক এই স্তুতি। এই স্তুতিকে নারায়ণী স্তোত্র বলে।

গ্রন্থমধ্যে স্তবগুলির অপূর্বতা সর্বাধিক। ইহার মধ্যে তিনটি বিষয় একত্রীভূত হইয়াছে। দার্শনিক তত্ত্ব, ভক্তিরস ও উচ্চ সাহিত্যের উপাদান—এই তিনের মিশ্রণে স্তবগুলি পরম প্রসন্ন-গম্ভীর হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে মহাশক্তি সম্বন্ধে যে অনুভূতি, স্তবগুলির মধ্যে তাহা পরিস্ফুট। তন্ত্রবিজ্ঞানের দার্শনিকতা জানিতে হইলে স্তবগুলির আলোচনা অপরিহার্য্য।

বিশ্বেশ্বরী স্তোত্র

কারণসমুদ্রে মহাবিষ্ণু নিদ্রিত। নাভিকমলে ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টির ধ্যানে নিমগ্ন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দুই অসুর ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণুর জাগরণার্থ তাঁহার নয়নাশ্রিতা যোগনিদ্রাকে স্তব করেন।

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি সংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥

বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতি ও সংহারকারিণী অনুপমা। ইনি তেজোময় বিষ্ণুর নিদ্রারূপিণী। ব্রহ্মা তাঁহার স্তব করিতেছেন। তন্ত্রমতে দেবশক্তি মন্ত্রের মধ্যে নিদ্রিত থাকেন। দেবতাকে জাগাইতে হইলে মন্ত্রচৈতন্য করিতে হয়। ব্রহ্মা তাই প্রথমে মন্ত্ররূপিণী দেবীকে স্মরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মা বলিলেন—তুমি

ত্রিমাত্রারূপে (অ, উ, ম) অবস্থিত অক্ষর। তুমি গুণাতীতা, অর্ধমাত্রা-গণ ময় ও গুণাতীতের সংযোগভূমি। হে, দেবী, তুমি সাবিত্রী—

বিশ্বপ্রসবিত্রী গায়ত্রী মন্ত্রে তুমি উৎকৃষ্টা মাতা। তুমি জগৎ সৃষ্টি কর—তুমি পালন কর, অন্তে তোমাতেই লয় হয়। কর্তৃরূপে সৃষ্ট কর—আবার কর্মরূপে তুমি পালিত হও। অধিকরণরূপা তোমাতেই সব বিলীন হয়।

পরমবিদ্যাস্বরূপ তত্ত্বমসিবাক্যের তুমি মূর্তি—তাই তুমি মহা-দিব্যা। সর্বজনমোহিনী বলিয়া তুমি মহামায়া। বিশ্বের যাবতীয় অর্থের অসাধারণ কর্তা—তুমিই মহামেধা। বেদবিদ্যারূপী মহাস্মৃতি তুমি। জীবের ভোগ ইচ্ছারূপ মহামোহ তোমা হইতেই। মহাদেবশক্তি তুমি (মহাদেবী)। মহা আসুরী শক্তিও তুমি (মহাসুরী)।

স্বত্ত্ব রজঃ তমঃ রূপিণী তুমি আদি প্রকৃতি। যখন তমো-গুণের লয় হয়—সেই মহারাত্রিও তুমি। সর্বসম্পদ, সর্বেশ্বরী, বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, ক্ষান্তিক্ষমারূপে তুমিই বিরাজমানা। খড়গধারিণী, শুক্রধারিণী, নরমুণ্ডধারিণী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, লৌহকণ্টকাকীর্ণ লগুড় (ভূষণ্ডী) ধারিণী, শঙ্খধারিণী ধনুর্বাণ-ধারিণী এই বিভিন্ন মূর্তি—তোমারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। ঐহিক সুখদাত্রীরূপে তুমি সৌম্য, স্বর্গসুখদাতারূপে তুমি সৌম্যতরা। মোক্ষসুখদাতারূপে তুমি অশেষ সৌম্যতমা পরমাসুন্দরী। হে সর্বময়ি, যে কোন স্থানে যাহা কিছু উত্তম ও মধ্যম বস্তু আছে—সেই সকলের তুমি শক্তি। সুতরাং তোমাকে কি স্তব করা যায় ?

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি পালনকর্তা যে বিষ্ণু—তাহাকেও তুমি নিদ্রায় বশীভূত করিয়াছ। এহেন তোমাকে জগতে কে স্তব করিতে পারে? বিষ্ণুকে, শিবকে ও আমাকে তুমি শরীর ধারণ করাইয়াছ। সুতরাং তোমাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে? তথাপি সাধ্যমত কিছু বলিলাম। কৃপাশক্তি বিস্তার করিয়া মধু ও কৈটভ নামক এই দুর্জয় অসুর দুইটিকে মোহিত কর ও জগৎপ্রভু বিষ্ণুকে জাগরিত করিয়া দাও এবং ইহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি দাও।

মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু॥
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ॥

এই স্তবে ব্রহ্মা মন্ত্ররূপিণী মহাকালিকা শক্তির তত্ত্ব ও মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। তিনটি প্রার্থনা জানাইয়াছেন—জগৎপ্রভুকে জাগ্রত করিয়া দাও, অসুর দুইটিকে মোহিত কর ও উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য বুদ্ধি দাও। দেবী এই তিনটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিয়াছেন।

প্রত্যেক জীবহৃদয়ে পরমপুরুষ নিদ্রিত আছেন। মহামায়ার কৃপায় তিনি জাগ্রত হইলে এবং রজঃতমঃগুণরূপী অসুরদ্বয় বিনষ্ট হইলেই পরমকল্যাণের পথ খুলিয়া যায়।

মহিষহন্ত্রী স্তুতি

মহিষহন্ত্রী স্তুতি চণ্ডীগ্রন্থে চতুর্থ অধ্যায়ে মহিষাসুর বধের পর অনন্দোৎফুল্ল ও কৃতজ্ঞ দেবতাগণের স্তব। স্তবে সাতাশটি মন্ত্র আছে। কাব্যাংশে স্তুতিটি নিরুপম। যাঁহারা স্তব করিতেছেন,

তাঁহাদের মনের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা কিভাবে দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন প্রথম মন্ত্রে। দেবতাগণ "প্রণতিনম্রশিরোধরাংসা" এবং 'প্রহর্ষপুলকোদ্‌গম-চারুদেহাঃ'। তাঁহারা প্রণতিশীল। তাঁহাদের গ্রীবা ও স্কন্ধ অবনত। আনন্দে তাঁহাদের দেহ রোমাঞ্চিত। পুলক-বশতঃ তাঁহাদের দেহের সুকুমারতা যেন অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জগন্মাতার তত্ত্ব ও মহিমা কীর্তন। জননী 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যা'—নিখিল দেবগণের তেজ ও শক্তিরাশির সমষ্টিভূতমূর্তি জগজ্জননী-দুর্গা। তিনি নিখিল দেবমহর্ষিগণের পূজাস্পদা (অখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং)। মায়ের প্রভাব অতুলনীয়, অনন্ত। শিব ব্রহ্মা কেহই বর্ণনা করিতে পারেন না (ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং)।

পুণ্যাত্মার গৃহে তুমি লক্ষ্মীরূপা। পাপীর গৃহে অলক্ষ্মীরূপা। নির্ম্মলমতি ব্যক্তিগণের অন্তরে তুমি বুদ্ধিরূপা। সাধুর চিত্তে শ্রদ্ধারূপা। হে মাতঃ, তোমার রূপ অচিন্ত্য। তোমার বীর্যবত্তা অপরিসীম। তুমি ত্রিগুণময়ী হইয়াও রজঃ-তমাদি দোষে লিপ্ত নও। তুমি হরিহরের অজেয়। তুমি অব্যক্ত আদ্যাপ্রকৃতি। দেবগণের তৃপ্তি হেতু স্বাহা মন্ত্র তুমিই। পিতৃগণের তৃপ্তিহেতু স্বাধামন্ত্রও তুমিই। ঋক্‌বেদের ছন্দোবন্ধ মন্ত্রও তুমি। যজুর্বেদের গদ্যমন্ত্রও তুনি। সামবেদের গীতময় মন্ত্র তুমিই। তুমি বেদবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, সর্বদুঃখহন্ত্রী। তুমি দুর্গা—দুর্গমভবসাগরের নৌকা (দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌঃ)। তুমি বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী লক্ষ্মী। শিবের অর্ধাঙ্গভূতা গৌরী।

তোমার বদন মণ্ডল সুন্দর ; ঈষৎ হাস্যযুক্ত, সুনির্মল, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ সুবর্ণবর্ণ। 'ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্রবিম্বানুকারি-কনকোত্তমকান্তিকান্তম্'। ঐ মুখখানি দেখিয়াও ক্রুদ্ধ মহিষাসুর তোমাকে যে প্রহার করিয়াছিল ইহা অতি আশ্চর্য্য। তুমি যখন কোপযুক্ত হইয়াছিলে তখন তোমার ভ্রূকুটিকুটিল বদনখানি উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল—(ভ্রূকুটী-করাল-মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি)। সেই কুপিত বদন দেখিয়া মহিষাসুর যে তখনই প্রাণত্যাগ করে নাই—ইহাও অতি আশ্চর্য্য। কালান্তক যম দর্শন করিয়াও কি প্রাণ ধারণ করা যায়—(কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন)? তুমি কি পারিতে না একটিবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই সকল অসুরকে ভস্মীভূত করিতে? অবশ্যই পারিতে। তবে যে তাহাদের প্রতি এত অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ তাহার অবশ্যই গূঢ় কারণ আছে।

তোমার স্নেহ শত্রুদের উপরও অপরিসীম। শত্রু হইলেও অসুরগণ তোমার সন্তান। তাহারা শস্ত্রস্পর্শে পবিত্র হইয়া (শস্ত্রপূতা) উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক এইরূপ তাহাদের সম্বন্ধে তোমার অন্তরে শুভেচ্ছা সততই বিরাজমান। তোমার অস্ত্র-শস্ত্রের উজ্জ্বলতা, শূলের অগ্রভাগের চাকচিক্য দেখিয়াও অসুর-গণের দৃষ্টিশক্তি যে নষ্ট হয় নাই তাহার কারণ, ঐ সময় তাহারা তোমার কারুণ্যপূর্ণ বদনখানিও দেখিতেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার নিষ্ঠুরতা ভীষণ। কিন্তু ঐ সময় তোমার চিত্তে কৃপার প্রবাহও অগাধ (চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা) এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবের

অপূর্ব মিলন। একই সময়ে একাধারে নিষ্ঠুরতা ও স্নেহপরায়ণতা একমাত্র তোমাতেই সম্ভব।

তুমি অসুর নাশ করিয়া আমাদের ভয় দূর করিয়াছ, ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছ, আবার যাহাদিগকে নাশ করিয়াছ তাহাদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়াছ (নীতা দিবং রিপুগণা) অদ্ভুত তোমার কর্ম, তোমাকে নমস্কার! খড়্গ, শূল, গদা—এই সমস্ত অস্ত্র তোমার করপল্লবে বিরাজমান। তাহার দ্বারা—আমাদিগকে রক্ষা কর। বেগে ত্রিশূল ঘুরাইয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকের অমঙ্গল নাশ কর। তোমার যত যুদ্ধের রূপ (সৌম্যানি যানি রূপাণি) ও যত ভয়ঙ্কর মূর্তি (অত্যন্তঘোরাণি) তাহার দ্বারা আমাদিগের ও পৃথিবীবাসী সকলের কল্যাণ বিধান কর।

জগজ্জননীকে সম্মুখে দর্শন করিতে করিতে দেবতাগণ এই স্তুতি করেন। বর্ণনার চমৎকারিতা ও দার্শনিকতার গভীরতার মিলনে এই স্তুতিটি পরম উপাদেয়! স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবী দেবতাগণকে বর দিতে চাহিলেন। দেবগণ বলিলেন, যখন স্মরণ করিব তখনই বিপদ হইতে রক্ষা করিও (সংস্মৃতা সংস্মৃতা ত্বাং নো হিংসেথাঃ পরমাপদঃ)। দেবতারা আরও একটি বর চাহিলেন—যাহারা এই স্তব দ্বারা তোমাকে স্তুতি করিবে—তাহাদের প্রতিও প্রসন্না থাকিও। তাহাই হইবে বলিয়া জগজ্জননী অন্তর্হিতা হইলেন।

দেবীসূক্ত (বিষ্ণুমায়াস্তুতি)

শুম্ভ নিশুম্ভ অসুরদ্বয়ের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতাগণ হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া মহাদেবীকে স্তব

করিয়াছিলেন। তন্ত্রমতে এই স্তবটিকে দেবীসূক্ত বলা হয়। মূল গ্রন্থে বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিলেন এইরূপ উক্তি আছে (বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ)। এই স্তবটি চণ্ডীগ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে অবস্থিত। এই স্তবে জগন্মাতা সম্মুখে নাই। তাঁহাকে সম্মুখে প্রকটিত করাইবার জন্যই এই আহ্বান। স্তোত্রটি প্রণতি-প্রধান। দেবতাগণ পুনঃ পুনঃ প্রণতঃ হইয়া জগন্মাতাকে আহ্বান করিতেছেন। ভগবদগীতার 'মাং নমস্কুরু' উপদেশের একটি যেন অপূর্ব দৃষ্টান্ত এই স্তবটি।

দেবীকে প্রণাম, মহাদেবীকে প্রণাম, শিবশক্তিকে, মহাপ্রকৃতিকে, মহাকল্যাণকারিণীকে প্রণাম। জ্যোৎস্নারূপিণী সুখকারিণীকে প্রণাম। যিনি কল্যাণী, যিনি বুদ্ধি ও সিদ্ধি, যিনি রাক্ষসদের শক্তি, রাজাদের লক্ষ্মী, যিনি সর্বাণী তাঁহাকে নমস্কার। যিনি দুর্গা দুর্গমে পার করিয়া থাকেন, যিনি সকলের সার ও সকলই করিতে পারেন, যিনি জ্ঞানরূপা, কৃষ্ণবর্ণা ও ধুম্রবর্ণা তাঁহাকে নমস্কার। যিনি অতি স্নেহময়ী ও অতি ভয়ঙ্করী (অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ) তাঁহাকে প্রণাম। যিনি জগতের স্থিতিকারিণী ক্রিয়ারূপা—মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করি।

যিনি সকল পদার্থে বিষ্ণুমায়া বলিয়া কথিতা, যিনি সর্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে প্রণাম করি। দেহদ্বারা, বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা তিনবার তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি সর্বভূতে নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, ছায়ারূপে, শক্তিরূপে, তৃষ্ণারূপে, ক্ষান্তিরূপে, জাতিরূপে, লজ্জারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তিরূপে, লক্ষ্মীরূপে,

বৃত্তিরূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে, তুষ্টিরূপে, মাতৃরূপে ও ভ্রান্তিরূপে বিরাজমানা তাঁহাকে আমরা কায়মনোবাক্যে তিনবার প্রণাম করি—নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যিনি সমগ্র প্রাণের ও ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সর্বভূতে সতত দীপ্তিশালিনী, যিনি জীবাত্মারূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন সেই বিশ্বজননীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। পূর্বে বিপদের দিনে আমরা অভীষ্ট লাভের জন্য যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলাম, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমরা স্মরণ করিলেই তৎক্ষণাৎ সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন—সেই মহেশ্বরীকে আজ আমরা শত শত প্রণাম করিয়া আবাহন করিতেছি দৈত্যগণের উৎপীড়নে অতীব বিপন্ন হইয়া।

স্তবে তুষ্ট হইয়া মহাদেবী এক অপূর্বভাবে আত্মপ্রকাশ করিলেন। একটি বালিকা যেন স্নানে যাইতেছেন এই ভাবে উপস্থিত হইয়া পার্বতী দেবতাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কাহাকে স্তব করিতেছ (ভবদ্ভিঃ স্তূয়তেঽত্র কা) ?'

তখন এক কল্যাণময়ী দেবী তাঁহারই শরীরকোষ হইতে আবির্ভূতা হইয়া জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। বলিলেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ইহারা আমাকেই স্তব করিতেছে। কোষ হইতে নির্গতা এই কৌষিকী দেবী তখন অতি মনোহর রূপ ধারণ করিলেন (পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্)। যে পার্বতীদেবীর অঙ্গ হইতে নির্গত হইলেন তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গেলেন এবং কালিকা নামে খ্যাত হইলেন।

নারায়ণী স্তুতি

মহাদেবী দুর্গা অগণিত সৈন্যসামন্ত সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের বধসাধন করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তখন পরমানন্দে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া (বহ্নিপুরোগমাঃ) জগজ্জননীর স্তব করিয়াছিলেন। এই স্তবটি চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে অবস্থিত। এই স্তবকে নারায়ণীস্তুতি বলে। ইহাতে চৌত্রিশটি মন্ত্র আছে। ভাব-গাম্ভীর্য্যে ও ভক্তি-মাধুর্য্যে এই স্তোত্রটি অতুলনীয়। হে শরণাগত দুঃখহারিণী দেবী প্রসন্ন হও। নিখিল জগতের তুমি একমাত্র আধারস্বরূপা (আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা)। তুমি রসরূপে সমস্ত বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছ। তুমি অনন্ত বীর্যশালিনী বৈষ্ণবীশক্তি। তুমি কাম-রূপা মহামায়া। সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে। সমস্ত বিদ্যা তোমারই মূর্তি। সকল নারীতে তোমারই কলাশক্তি—'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু' তুমি সর্ব-স্বরূপা প্রকাশরূপা ও মোক্ষদা। তুমি স্তবের পরপারে। তুমি এত উৎকৃষ্ট যে ভাষার সামর্থ্য নাই তাহা প্রকাশ করে (স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ)।

তুমি বুদ্ধিরূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান কর। কলাকষ্ঠাদি রূপ ধারণ করিয়া কালস্বরূপে তুমি সর্বক্ষণে সকল পদার্থের পরিণাম ঘটাও। অবশেষে মৃত্যু আনয়ন কর। হে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকল মঙ্গলজনকের মঙ্গল। সর্বশুভ ফলপ্রদা। সর্বকার্যার্থসাধিনী। তুমি ত্র্যম্বকা। জননী, দুহিতা ও জায়া এই তিন প্রকারে অম্বা। তুমি গৌরী, চিরবধূ তোমাকে

নমস্কার। তুমি সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের সনাতনী শক্তিস্বরূপা। তুমি শরণাগত দীনকাতরগণের পরিত্রাণকারিণী। সর্বজনের সর্ব-ব্যাধি বিনাশকারিণী।

তুমি হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান কর। তুমি ব্রহ্মাণী। কুশাগ্র-দ্বারা কমণ্ডুল জল ছিটইয়া তুমি শান্তিবারি বর্ষণ কর (কৌশাম্ভঃ ক্ষরিকে)। তুমি মাহেশ্বরী। ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র ও সর্পাভরণ ধারণ করিয়া তুমি মহাবৃষভের উপর আরোহণ কর। আবার তুমি কৌমারী। মহাশক্তি ধারণ করতঃ ময়ূর কুক্কুটের উপর আরোহণ কর। তুমি শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারিণী বৈষ্ণবীশক্তি। তুমি বারাহী শক্তি, ভয়ঙ্কররূপ ধারণ করিয়া মহাপ্রলয়ে জলমগ্না পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধার কর ('দংষ্ট্রোদ্ধৃত-বসুন্ধরে')। তুমি নারসিংহী শক্তি। নরসিংহীরূপে হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া ত্রিলোক রক্ষা কর। তুমি কিরীট ও মহাবজ্রধারিণী। ঐন্দ্রীশক্তি তুমি সহস্রলোচনা ও বৃত্রাসুরের বধকারিণী। তুমি শিবদূতী। দৈত্যদিগের মহাসৈন্য তুমি বিনাশ করিয়াছ। তোমার রূপ ভয়ঙ্কর, শব্দ ভীষণ। তুমি চামুণ্ডা। বিকট দন্ত হেতু তোমার বদন ভয়ঙ্কর। তুমি মুণ্ডমালাশোভিতা। চণ্ডমুণ্ড মহাদৈত্যকে তুমি বিনাশ করিয়াছ। তুমি লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি ও স্বধা-স্বরূপিণী। তুমি মহারাত্রি, মহামায়া মেধা, সরস্বতী, মহাশক্তি, সত্যস্বরূপা, সর্বেশ্বরী ও সর্বসমষ্টি। হে নারায়ণি! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্না হও।

তোমার ত্রিনয়নযুক্ত বদন আমাদের রক্ষা করুক। তোমার ত্রিশূল আমাদের কল্যাণ করুক। তোমার যে ঘণ্টা শব্দদ্বারা

জগৎপূর্ণ করিয়া অসুরের তেজ নষ্ট করিয়া থাক, সেই শব্দদ্বারা মাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করে সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর—'পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব'। অসুরের রক্তলিপ্ত তোমার খড়গ আমাদের কল্যাণাবিধায়ক হউক।

তুমি তুষ্ট হইলে সকল দুঃখ যায়। তুমি রুষ্টা হইলে সকল অভীষ্ট নষ্ট হয়। তোমাকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা সকলের আশ্রয়স্থল হয় (ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি)। আজ বহু মূর্তি ধারণ করিয়া তুমি ধর্ম-বিদ্বেষী অসুরদিগের যে বধসাধন করিয়াছ তাহা তুমি বিনা আর কে করিতে পারে? একদিকে তুমি উজ্জ্বল আলো বিবেকদীপ, অন্যদিকে তুমি মহান্ধকার মমতাগর্ত। এই দুই দিকেই তুমি জীবগণকে চালাও। তুমি বিশ্বেশ্বরী বিশ্বরক্ষা করিতেছে। তুমি বিশ্বরূপা তাই বিশ্বকে ধারণ করিতেছ। তুমি বিশ্বেশ্বরের বন্দনীয়া বিশ্বেশবন্দ্যা। যাহারা তোমার পাদপদ্মে ভক্তিপ্রণত তাহারা বিশ্বের আশ্রয়-স্বরূপ (বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ)। হে বিশ্বের ক্লেশহারিণী দেবী! প্রণতদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। ত্রিভুবনবাসীদের প্রতি বরদাত্রী হও—(ত্রৈলোক্যবাসিনীমীড্যে লোকানাং বরদা ভব")।

জগজ্জননীকে সম্মুখে রাখিয়া দেবগণ এই স্তব করিলেন। মাতা বলিলেন, আমি বরদাত্রী। জগতের হিতকর (জগত্য উপকারকম্) যে বর মনে ইচ্ছা কর, তাই দিব। দেবগণ বলিলেন, আমাদের সকলের শত্রু বিনাশ কর যাহাতে বিশ্বের কল্যাণের পথে সকল বাধা দূরীভূত হয়। মানবকল্যাণের যাহারা বাধক তাহাদের দুর্বুদ্ধি দূর কর।

পূজাতত্ত্ব

(ক)

মহাশক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। মাতার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ আমাদের বিস্মরণ হইয়া গিয়াছে। মাতা প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাছে আসিতেছেন—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ লইয়া আমাদেরই তুষ্টি পুষ্টি বিধনার্থ তিনি আসিতেছেন। আর দুর্ভাগা সন্তান আমরা এমনই স্মৃতিভ্রষ্ট যে তাঁহারই দেওয়া ধন ভোগ করিতেছি, তাঁহারই আদরে বর্দ্ধিত হইতেছি অথচ তাঁহাকে লক্ষ্য করি না।

স্মৃতিভ্রংশতারূপ অর্গলে আমাদের হৃদয় দুয়ার রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সহস্রবার মা আসিয়া ফিরিয়া যান আমরা রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া তাঁহাকে বসিবার আসন দেই না। এই রুদ্ধ দুয়ারকে খুলিবার যে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত নিরূপম উপায় তাহারই নাম পূজা। মহাশক্তির সঙ্গে আমাদের বিস্মৃত সম্বন্ধটি পুনঃ স্থাপন প্রসঙ্গে সকল শাস্ত্রকারগণই কোনও না কোন উপায়ের সন্ধান দিয়াছেন। বৈদিক শাস্ত্র বলিয়াছেন যজ্ঞের কথা, তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন পূজার কথা।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বৈদিক ও তান্ত্রিক সভ্যতা যখন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে, তখন সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে যজ্ঞ ও পূজা দুই-ই পাশাপাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। দুয়ের মূল উদ্দেশ্য একই। গৌণ দৃষ্টিতে দুয়ের উদ্দেশ্য কাম্যবস্তু লাভ। মুখ্য দৃষ্টিতে উভয়ের উদ্দেশ্য মুখ্য বস্তু ব্রহ্মপদ লাভ।

পূজার দুইটি দিক—একটি বাহিরের দিক সেটি বিজ্ঞানধর্ম্মী ; অপরটি অন্তরের দিক সেটি আত্মধর্ম্মী। বাহিরের দিক হইতে পূজা একটি বিজ্ঞান সম্মত পন্থাবিশেষ (scientific technique) অন্তরের দিক হইতে পূজা একটি আত্মধর্ম্মী প্রেমপূর্ণ সমর্পণ বিশেষ। ইহা কেবল মাতৃরূপা মহাশক্তির নিকট পৌঁছাইবার পথ মাত্র নয়। মাতৃ-অঙ্কে আরোহণ করিয়া মাতৃত্বের স্নিগ্ধতার আনন্দে পূর্ণ হওয়াও পূজারই ফল। পূজা নিম্নাধিকরীর জন্য এই মত তন্ত্র পোষণ করেন না। মায়ের কাছে যাইবার ও তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় পূজা। ইহাতে অনধিকার কাহারও নাই।

পূজার অনুষ্ঠানগুলির মূল বৈজ্ঞানিক। মনে করুন, আপনার গৃহে উৎসবানুষ্ঠান। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় গৃহ প্রাঙ্গণ সজ্জিত। হঠাৎ সকল আলো নিভিয়া গিয়া বাড়ী ঘর আঁধার করিয়া দিল। আপনি পথ চাহিয়া দেখিলেন রাজপথ ও পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ী ঘর আলোকে উদ্ভাসিতই আছে।

আপনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে আপনার বাড়ীর সঙ্গে মূলকেন্দ্রের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আপনি বৈদ্যুতিক মিস্ত্রী ডাকিলেন। তাহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির নির্ঘণ্ট দিল। আপনি আনাইয়া দিলে তাহারা দুই দশ মিনিট খাটিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গেল। পূজা ব্যাপারটিও এইরূপ দুই দুইয়ে যোগে চার হওয়ার মত।

জগতের সকলেই শক্তিমান। আপনি শক্তিহীন কেন? তন্ত্রশাস্ত্র উত্তর দিবে। আপনি শক্তির মূল কেন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ

হারাইয়াছেন। আবার সম্বন্ধ স্থাপন করুন। উপায় কি ? উপায় পূজা। পূজায় কি লাগিবে ? পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দিন— তিনি আসিয়া ধান মান কলা কচুর নির্ঘণ্ট দিবেন। যথাযথ দ্রব্যাদি দ্বারা যথাযথ পূজা হউক। শক্তির আলো জ্বলিয়া উঠিবে। মাকে আবার পাইবেন। নিশ্চয়ই পাইবেন। গল্প নহে। শত সহস্র প্রমাণ আছে।

শ্রীগীতায় যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি পরম শ্লোক আছে—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

যজ্ঞের সবই ব্রহ্মময়। অগ্নিও ব্রহ্ম, হবনীয়ও ব্রহ্ম, অর্পণও ব্রহ্ম, হবনক্রিয়ার কর্ত্তাও ব্রহ্ম, জ্ঞানী এই প্রকার সমস্ত ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন।

পূজা সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ ভাবনা প্রয়োজন। পূজার সকল উপকরণই ঈশ্বরময়। পূজার পূর্ব্বে প্রত্যেকটি উপচারকে শুদ্ধ করতঃ অর্চ্চনা করিয়া ঈশ্বরময় করিয়া লইতে হয়। এমন কি যে পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা হইবে, তাহাকেও অর্চ্চনা করিতে হয়। পুষ্পকে অর্চ্চনা করিয়া "এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া ফুলগুলি তাহার অধীশ্বর বিষ্ণুময় এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধিকালে পূজক পূজ্য দেবতার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া যায়।

পূজার অন্তর দিকটি হইল সমর্পণের কথা। চন্দনমাখা পুষ্প দেবতার পায়ে সমর্পণ করি। মূলে ওটি অনুরাগমাখা আত্মদান।

ওটি দিতে দিতে ক্রমে জীবনটিই পূজাময় হইয়া উঠে। শেষে জীবনের সকল কর্ম্মই তাঁহার পূজায় পরিণত হয়।

'যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনায়।' যে যে কর্ম্ম করি সকলই তোমার আরাধনা। এই পূজার প্রধান উপচার ভক্তি। ভক্তিবশ ভগবান্। ভক্ত ভক্তি করিয়া তাঁহাকে যাহা অর্পণ করে তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মসমর্পণ। ঐ দানে তিনিও সর্ব্বাধিক সুখী। পূজায় আর একটি প্রয়োজনীয় বস্তু মন্ত্র। মন্ত্রতত্ত্ব বিশ্লেষণে তন্ত্রশাস্ত্র সকল শাস্ত্রের রাজা। মন্ত্র শব্দের অর্থ হইল "মননাৎ ত্রায়তে" যে বস্তু মনন করিতে করিতে ত্রাণ পাওয়া যায়। মন্ত্র বলিতে ভগবন্নাম, ভগবদ্‌বোধক শব্দ। বেদের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রী। তন্ত্রশাস্ত্র বহু দেবতার বীজমন্ত্রের দ্রষ্টা। তন্ত্রমতে প্রত্যেকেরই ইষ্টদেবতার বীজ প্রণবতুল্য। প্রণবের বাচ্য ব্রহ্ম। দেবতার মন্ত্রের বাচ্য দেবতা। তত্ত্ববিচারে ব্রহ্ম ও দেবতায় ভেদ নাই। বেদশাস্ত্রে আছে—

"একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি"

একই সদ্বস্তুকে পণ্ডিতগণ বহু নামে বলিয়া থাকেন। সুতরাং নিজ ইষ্টমন্ত্র প্রণবের সঙ্গে অভিন্নই।

মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বস্তু অভিন্ন। চণ্ডী বলিয়াছেন—মাকে লক্ষ্য করিয়াই—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা॥

হে নিত্যে, হে অক্ষরে, তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমিই বষট্‌কার ও স্বরস্বরূপিণী। তুমি অমৃতরূপা ও ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা। অর্থাৎ তুমি ও প্রণব অভিন্ন।

মন্ত্র ও মন্ত্রপ্রতিপাদ্য দেবতা যে অভিন্ন ইহার অনুভূতি হয় মন্ত্রের চৈতন্য হইলে। জপ করিতে করিতে মন্ত্রচৈতন্য হয়। তেঁতুল বলিতেই যদি রসনায় জল আসে, তবে বুঝিতে হইবে যে তেঁতুল শব্দের চৈতন্য হইয়াছে। কালিকার বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিতেই যদি নৃমুণ্ডমালিনী বরাভয়করা দেবীর উদয় হয় তবে বুঝিতে হইবে এই বীজের চৈতন্য হইয়াছে।

মন্ত্রাক্ষরের একটি নিজস্ব শক্তি আছে। সেই শক্তিবলেই সে কার্য্য করে। অভিন্ন যে তৎপ্রতিপাদ্য বস্তু তাহাকে টানিয়া আনে। এইটি মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক দিক। আবার ইষ্টলাভের জন্য ব্যাকুলতাযুক্ত মনপ্রাণ লইয়া মন্ত্র উচ্চারণে মন্ত্রচৈতন্যময় হইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এটি মন্ত্রের আধ্যাত্মিক দিক। মন্ত্রের শক্তিও কার্য্য করিবে—জাপকের ভক্তিও কার্য্য করিবে। শক্তি হৃদয়ে, তবে ভক্তিকে জাগাইবে। ভক্তি শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবে।

মেধস ঋষি মাতৃদর্শন লাভের জন্য সুরথ সমাধিকে পূজাই করিতে বলিয়াছিলেন।

তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীং।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপমোক্ষদা॥

ঋষির আদেশে সমাধি ও সুরথ রাজা পূজা করিয়া মহাশক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভাবে পূজ

করিয়াছিলেন। উহাই তন্ত্রোক্ত পূজার বিশিষ্ট রূপ। তাঁহাদের পূজার কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে।

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ ॥
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্ ॥
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ ॥
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্ ॥
এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা ॥

উত্তর চরিত ৯—১২

অম্বিকার দর্শনের জন্য নদীপুলিনে গিয়া দেবীসূক্ত জপ করিলেন। নদীর পুলিন তপস্যার অনুকূল স্থান। কোন্ স্থান পূজার যোগ্য স্থান সে সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বহু নির্দেশ আছে। বিল্বমূল, তুলসী-কানন, দেবায়তন, গুরু-সন্নিধানে, যেখানে চিত্তের সহজে একাগ্রতা হয় এই সব বহু কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—

সর্ব্বেষা-মুত্তমং প্রোক্তং নির্জ্জনং পশুবর্জ্জিতং

তৎপর দেবীসূক্ত জপ করিলেন। দেবীর শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রাক্ষরের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণকে জপ কহে। জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তিঃ। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"

তন্ত্র-শাস্ত্রও কহিয়াছেন—"জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ" মন্ত্র জপের পদ্ধতি সম্বন্ধে তন্ত্রশাস্ত্রে বিস্তর কথা আছে।

মনঃ সংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনং।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ ॥

বৈষয়িক চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া শুচিভাবে মৌন ভাবে মন্ত্রের অর্থ চিন্তা সহ ব্যগ্রতাশূন্য হইয়া মনে কোনও প্রকার দুঃখভাব না রাখিয়া জপ করাই সিদ্ধি লাভের হেতু।

পতঞ্জলিও কহিয়াছেন "জপস্তদর্থ ভাবনং" জপের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রার্থের ধ্যান হইবে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন প্রথমে ধ্যান তৎপর মন্ত্রজপ করিবে। পরে ধ্যানান্তেও মন্ত্র জপ করিবে—

আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্যান্তে পুনর্জপেৎ—
ধ্যানেমন্ত্র সমাযুক্তাঃ শীঘ্রং সিদ্ধতি সাধব।

মন্ত্র সঙ্গে মন্ত্রার্থের চিন্তা, মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতার ধ্যান বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধ্যান ও মন্ত্র সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়।

তারপর তাঁহারা নদী তীরে দেবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পুষ্প ধূপ হোম ও তর্পণ দ্বারা মায়ের পূজা করিয়াছিলেন।

অনেকেই মনে করেন বেদে মূর্ত্তি পূজার কথা নাই। আর্য্য সমাজীরা খুব জোর করিয়াই বলেন। যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া দেব-পূজা ভারতীয় দৃষ্টিতে তন্ত্রশাস্ত্রেরই মহাদান।

পূজা-তত্ত্ব

(খ)

"কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্"

শ্রীচণ্ডী ১৩।১০

মায়ের মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য। ঋষির আদেশে ও নির্দ্দেশেই তাঁহারা পূজা করিয়াছিলেন। মূর্ত্তিটি যে মৃণ্ময়ী হইয়াছিল একথা চণ্ডীতে সুস্পষ্ট।

প্রতীক অবলম্বনে ভগবদর্চ্চনা হিন্দু সংস্কৃতিতে তন্ত্র-শাস্ত্রের অতুলনীয় দান। বেদশাস্ত্রে মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদযশঃ" ইত্যাদি অনেক বৈদিক উক্তি প্রতিমা অর্চ্চনের অপক্ষপাতী বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের শ্রেষ্ঠ উপায় বৈদিক মতে—"যজ্ঞ" এবং তান্ত্রিক মতে "পূজা"।

যজ্ঞে কোন মূর্ত্তির আবশ্যকতা থাকে না। অগ্নিকে সকল দেবতার মুখ ভাবনায় (অগ্নিমুখাঃ বৈ দেবতাঃ) একমাত্র অগ্নির মাধ্যমেই সকল দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞে দ্রব্যাদির সমর্পণ চলে। পূজায় কিন্তু প্রতিমা অপরিহার্য্য। ঈশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতাকে অন্তরঙ্গ ও প্রগাঢ় করিতে হইলে অর্চ্চনাঙ্গই সর্ব্বাধিক শক্তিশালী একথা ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ আচার্য্যগণেরও অনুমোদিত তথ্য।

কোন কোন আচার্য্য "অরুন্ধতী ন্যায়" অবলম্বনে প্রতীক

পূজায় সার্থকতা স্থাপন করেন। আকাশের উত্তর ভাগে সপ্তর্ষি-মণ্ডল নামে যে নক্ষত্রমণ্ডল আছে উহার মধ্যে একটি নক্ষত্রের নাম হইল বশিষ্ঠ। ঐ বশিষ্ঠের পার্শ্বে অরুন্ধতী বিদ্যমান। অরুন্ধতী অত্যন্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্র। তাহাকে চিনাইতে হইলে আগে বশিষ্ঠকে দেখাইতে হয়। বশিষ্ঠ পরিচিত হইলে অরুন্ধতীকে পাওয়া অতি সহজ হইয়া পড়ে। পণ্ডিতেরা ইহাকে "অরুন্ধতী ন্যায়" বলেন। এই ন্যায়টির তাৎপর্য্য হইল, সূক্ষ্মবস্তু সম্বন্ধে অবগতির জন্য স্থূল বস্তুর সাহায্যাপেক্ষা। পরমতম বস্তু ঈশ্বরকে জানিবার জন্য তদ্রূপ স্থূলবস্তুর অপেক্ষা। ইহাকেই বলে প্রতীকোপাসনা। প্রতীক-রূপেই মূর্ত্তি পূজার প্রয়োজনীয়তা। যে বস্তু ব্রহ্ম নয় তাহাকে অবলম্বন করিয়া বহ্ম বস্তুর অনুসন্ধান। স্থূল-বুদ্ধি প্রবর্ত্তকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর উপায় আর কি হইতে পারে ?

ভগবদ্ বিগ্রহ প্রতীক বটে কিন্তু ইহাই মূর্ত্তি সম্বন্ধে শেষ কথা নহে। সাধনা-যাত্রার প্রারম্ভে শ্রীমূর্ত্তি প্রতীক হইতে পারে কিন্তু সাধনের পরিণতিতে উহা চিন্ময় সত্তা। প্রতীক-রূপতার চিন্ময়-রূপত্বে পরিণতি হইলেই পূজা সার্থক হয়। যিনি একদিন ছিলেন অপরিচিত লোক—তাঁহারই সঙ্গে যেমন বহু মিলামিশার পরে হইয়া উঠেন পরম বন্ধু—সেইরূপ প্রতীক-রূপে যে মূর্ত্তির হয় প্রতিষ্ঠা, ভক্তের অর্চ্চনার ফলে তিনিই হইয়া যান চিদ্‌বিগ্রহ—সাক্ষাৎ ভগবান্—আচার্য্য শ্রীরামানুজের ভাষায় "অর্চ্চাবতার"।

আচার্য্য রামানুজের নিকট একদা জনৈক মূর্ত্তি-পূজায় আস্থাহীন ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি আচার্য্যকে

জিজ্ঞাসা করেন "ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য আপনি ছোট ছোট কতগুলি পিতলের মূর্ত্তি রাখিয়াছেন কেন?" আচার্য্য বলিলেন "আমার ধুনী জ্বালাইবার জন্য আগুনের প্রয়োজন আপনি গ্রাম হইতে আমাকে একটু আগুন আনিয়া দেন, তারপর আপনার প্রশ্নের জবাব দিব।" ঐ লোকটি আগুন লইয়া উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য বলিলেন, "আপনি একখণ্ড দগ্ধ কাষ্ঠ আনিয়াছেন কেন? যাহা কহিয়াছি ঠিক তাহাই আনুন। আগুন কহিয়াছি আগুনই আনুন। আগুন সকল বস্তুর মধ্যেই আছে। আপনার হাত ঘষিয়া দেখুন, হাতের মধ্যেও আগুন আছে। আপনি আমার জন্য একটু খাঁটি আগুন আনুন—পোড়া কাষ্ঠ চাই না।"

আচার্য্যের কথা শুনিয়া লোকটি উত্তর করিল, "অগ্নি আছে ত সকল বস্তুর মধ্যেই কিন্তু আপনার নিকট আনিতে হইলে দগ্ধকাষ্ঠ ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না।" তখন আচার্য্য গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সকল বস্তুতে নিহিত অগ্নিকে আমার নিকট আনিতে যেমন দগ্ধকাষ্ঠ আরোহণ করান ছাড়া আর কোন উপায় আপনি দেখেন না—আমিও সেইরূপ সর্ব্বভূতস্থ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে আমার নিকটতম করিয়া আনিতে চাহিলে মূর্ত্তিতে আরোহণ করান ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতে পাই না। আপনার হাতের কাঠখানি আগে ছিল কাঠ, উহাতে অগ্নি ধরিলে উহা হইয়াছে অগ্নিই। আমার নিকটস্থ এই ঠাকুরটি একসময় ছিলেন পিতল কিন্তু এখন উহা চিণ্ময় পরব্রহ্ম, পরব্রহ্মের ইহা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। নারায়ণ যেমন অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন

রামরূপে, তিনি আজ আমার দুয়ারে আসিয়াছেন এই অর্চ্চাবতার রূপে।”

আচার্য্যের উক্তিতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সকল সংশয় দূর হইয়া গেল। বিগ্রহরূপে ভগবদর্চ্চনা, তন্ত্রশাস্ত্রের এই বিরাট দানকে শাস্ত্রকারগণ ও আচার্য্যগণ মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছেন—

য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্যুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিলোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ॥
লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ ॥

১১।৩।৪৭-৪৮

হৃদয়ের গ্রন্থিকে ছেদন করিতে যদি ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কেশবকে অর্চ্চনা করিবে। গুরুর নিকট হইতে আগমোক্ত পথ ও তাঁহার কৃপারূপ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের নববিধ ভক্তির মধ্যে অর্চ্চনাঙ্গ একটি প্রধান অঙ্গ। নারদপাঞ্চরাত্র, নারদভক্তিসূত্র, শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও পূজা বিশেষ একটি ভজনাঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী পাদকে শিক্ষা দিতে চৌষট্টী অঙ্গ ভজনের কথা কহিয়াছেন। তন্মধ্যে পাঁচটিকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য্য বলিয়াছেন। সেই প্রধান পঞ্চাঙ্গের মধ্যে অন্যতম “শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।” বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজ ছাড়া ভারতীয় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই পূজাঙ্গের

অপরিহার্য্যতা স্বীকার করেন। অদ্বৈতবাদী সাধকেরাও প্রবর্ত্তক কালে পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা আবশ্যক মনে করেন।

অগ্নি যেমন কাষ্ঠরূঢ়, ব্রহ্মবস্তু সেই প্রকার মূর্ত্ত্যারূঢ়। সুতরাং মূর্ত্তি যে কেবল অরুন্ধতী ন্যায়ে ব্রহ্মবস্তুকে চিনাইয়া দিবার উপায় মাত্র, তাহা নহে। উহাতে উপাস্য বস্তুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি ঘটে। বিগ্রহে বিরাজমান থাকিয়া তিনি ভক্তদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কার্য্যটি সাধন হয় ভক্তের ভক্তি এবং মন্ত্রের শক্তি বলে।

তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন,—গাভীর দুগ্ধ তাহার রক্ত হইতে সমুদ্ভূত। রক্ত গাভীর সর্ব্বাঙ্গেই বিরাজিত। তাই বলিয়া গাভীর যে কোন অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেই দুগ্ধ পাওয়া যায় না। একমাত্র স্তন্য হইতেই উহা ক্ষরিত হয় সেইরূপ শ্রীভগবানের সর্ব্বত্রাবস্থিতি সকল সময়ে থাকিলেও তাহার স্বরূপ উপলব্ধি প্রতিমাতেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে হইয়া থাকে।

সুতরাং মূর্ত্তি কেবল দেবতার প্রতিনিধি নহেন। ঐ মূর্ত্তিই দেবতা। পূজার অঙ্গগুলি যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে বিগ্রহে দেবতা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভক্তের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র অষ্টপ্রকার বিগ্রহের কথা কহিয়াছেন।—

শৈলী দারুময়ী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ ১১।২৭।১২

শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী চন্দনাদিময়ী (লেপ্যা), চিত্রপটময়ী (লেখ্যা), বালুকাময়ী, মনোময়ী ও মণিময়ী এই আট

প্রকারের প্রতিমা হইতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মনোময়ী প্রতিমাকে একপ্রকার প্রতিমা বলা হইয়াছে। চক্ষু নিমীলন করিয়া মানসে যদি তাঁহার মূর্ত্তি ভাবনা করিয়া অর্চ্চনা করি তাহা হইলেও প্রতিমা পূজা করা হইল। যাহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী কথাটি তাহাদের ভাবিবার মত। মূর্ত্তি (image) ছাড়া মন ভাবিতে পারে না—এই তথ্য বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞান-সম্মত। মনকে সঙ্গে নিলেই সে প্রতিমা তৈয়ারী করিবে। সুতরাং যাহারা প্রতিমা পূজার বিরোধী তাহাদিগকে উপাসনা করিতে হইবে—মনকে বাদ দিয়া। মনকে বাদ দিলে উপাসনা করিবে কে? মনোভূমির উর্দ্ধে শুদ্ধ চিদ্-ভূমিতে—যেখানে উপাস্য উপাসক উপাসনা একাকার হইয়া যায়—সেখানে উপাসনাও নাই, প্রতিমাও নাই। কিন্তু উপাসনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ প্রতিমা চাই-ই।

অনেকে মনে করেন প্রতিমায় দেবার্চ্চনা নিতান্ত অজ্ঞ অনধিকারী গ্রাম্য নরনারীর জন্য। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য নহে। একথা নিতান্তই অসার। পূজা কার্য্যটি এতই কঠিন যে মহা মহা-পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পূজা সম্পাদনে অক্ষম। পূজার উপচার সমূহের মধ্যে পূজকের মন একটি সর্ব্বপ্রাধান বস্তু। মনটিকে তৈয়ারী না করিলে অন্য সকল সম্ভারের প্রাচুর্য্য থাকিলেও পূজা হইবে না। আর মনটি যদি লুব্ধ ভ্রমরের মত ইষ্টের পাদপদ্মে লাগিয়া যায় তাহা হইলে উপচারহীন পূজাও কল্যাণদায়ক হয়। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য কিভাবে মাতৃপূজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচণ্ডী গ্রন্থ অবলম্বনেই স্মরণ করা যাইতেছে।

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥ ১৩।১১

আদৌ যতাহারৌ অল্পাহারৌ ততো নিরাহারৌ। প্রথমতঃ আহার সংযমপূর্ব্বক অল্পাহারী হইয়াছিলেন, তারপর ক্রমে ক্রমে একেবারেই আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন।

আহার বলিতে যে কেবল মুখদ্বারা খাদ্য গ্রহণ বুঝায়—তাহা নহে, যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্বিষয় আহরণই আহার-পদবাচ্য। সুতরাং বোঝা গেল যে সুরথ এবং সমাধি পূজকদ্বয় চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জ্জগৎ হইতে রূপ শব্দাদি গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু ভজনোন্মুখ কোন ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন—'কায়মনে মনুষ্য বিষয় গ্রহণ করিও না।' মায়ের পূজকদ্বয় সেইরূপ কায়মনে জাগতিক বিষয় গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

'নিরাহারৌ যতাহারৌ' বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিয়া তন্মনস্কৌ পদে অন্তরেন্দ্রিয় মনঃসংযমের কথা বলিতেছেন। একমাত্র জগন্মাতাতেই যাঁহাদের মন নিবিষ্ট তাঁহারাই তন্মনস্ক। বস্তুতঃ মনটি সর্ব্বতোভাবে ইষ্টচিন্তায় দিয়া তন্মনস্ক হইতে পারিলেই নিরাহার হওয়া সম্ভব। অন্তর সংযমই বহিঃ-সংযমের জনক। অন্তরে ইষ্ট-ধ্যান নাই অথচ বহিরিন্দ্রিয় সংযম ইহা কৃত্রিম। গীতাশাস্ত্র উহাকে মিথ্যাচার বলিয়াছেন।

মন দেবীর চরণে অর্পণ করিয়া বহিরিন্দ্রিয়গণকে বহির্ব্বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া তাঁহারা 'সমাহিতৌ' হইয়াছিলেন। 'সমাহিতৌ' পদের অর্থ কেহ বলিয়াছেন "ত্যক্তবাহ্যচেষ্টৌ"—

যাহাদের বাহ্যচেষ্টা ছিল না। কেহ কেহ বলেন সমাহিতৌ অর্থে গুরূপদিষ্টার্থে সাবধানৌ, নিরস্তসংশয়ৌ, বহুবিঘ্নপরিহারপরৌ নিয়মপরায়ণৌ—তাঁহারা ছিলেন গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট, প্রত্যেকটি বিষয়ে সাবধান সতর্ক, পাছে তাঁহাদের ভজনে কোন প্রকার ছিদ্র থাকে ও ফললাভে বাধা ঘটে। গুরু বাক্যকে সত্যরূপে গ্রহণ করায় তাঁহাদের চিত্তে কোন সংশয় ছিল না। গীতাশাস্ত্র "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" বলিয়াছেন। চিত্তে সংশয় থাকিলে সকল ভজন নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ভজন-পথে যত প্রকার বিঘ্নবাধা উপস্থিত হউক না কেন তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া পথে চলিতেই দৃঢ়সংকল্প। যেরূপ নিয়ম করিয়া তাঁহারা প্রত্যহ উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই সব নিয়মের প্রতি তাঁহাদের অসীম শ্রদ্ধা ছিল। কোন কারণেই নিয়মশৃঙ্খলার পথ হইতে তাঁহারা ভ্রষ্ট হন নাই। এই সকল কথাই সমাহিত শব্দ দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে বোঝা গেল তাঁহারা "শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি" এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া মাতৃপূজার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তাঁহারা মাতাকে উপহার (বলি) দিতেন স্বদেহ শোণিতদ্বারা অভিসিঞ্চিত করিয়া। "দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং" তৌ সুরথবৈশ্যৌ নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতং তপশ্চরণ কালে পরহিংসা পরাঙ্মুখত্বাৎ স্বশরীরোদ্ভবরক্তমেব অন্নময়ং বলিঞ্চ দদতুঃ—তপস্যা আচরণ করিবার কালে পরহিংসা করা অন্যায় এই হেতু তাঁহারা নিজ রুধির এবং অন্নময় চরু প্রভৃতি দ্রব্য মাতাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

তন্ত্রশাস্ত্রকার বলেন—নিজেদেহ হইতে রুধির দিলে দেবী সহস্রগুণ তুষ্ট হন।

"সহস্রং তর্পিতা দেবী স্বদেহ-রুধিরেণ।"

সকল বলির শ্রেষ্ঠ বলি নিজ অহঙ্কার বলি। স্বদেহ-শোণিত দান আত্মবলিদানের একটি প্রকৃষ্ট প্রতীক। অহংকার সমর্পণের ওটি স্থূলরূপ।

"বলিদানেভ্য সর্ব্বেভ্য শ্রেষ্ঠ আত্মবলিঃ স্মৃতং।"

আমাদের অন্তঃকরণরূপ পশুর "চিত্তাহংকৃতি-বুদ্ধিমানসময়ৈঃ" চারি পদ। চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই চারিচরণে অন্তঃকরণ পশু বিচরণ করে। এই পশুকে মায়ের চরণাম্বুজে যে ভক্ত বলিদান করেন, অণিমাদি অখিলসিদ্ধি তাঁহার চরণে লুটাইতে থাকে। ঐ পশু বধ করিবার অস্ত্র হইল বোধরূপ পরশু অর্থাৎ জ্ঞানরূপ কুঠার। এই পশূৎসর্গ ই প্রকৃত বলিদান।

এই ভাবে তাঁহারা তিনবৎসর মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন।

"এবং সমারাধয়তোস্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ"

যতাহার নিরাহার হইয়া একান্ত মনে সমাহিত চিত্তে নিজদেহজ শোণিতে মায়ের তুষ্টি বিধান করতঃ নিজেকে সর্ব্বতোভাবে মায়ের চরণে সমর্পণ করতঃ মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা ও দেবীসূক্ত জপ করিতে লাগিলেন দীর্ঘ তিনটি বৎসর। তারপর—

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।১৩।৩

জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা ভক্তদ্বয়ের সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রকটীভূতা, হইয়া কথা বলিলেন। মাতাকে তঁহারা কিরূপ দেখিলেন—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বর্ণনা দিয়াছেন—

স দদর্শ পুরো দেবীং গ্রীষ্মসূর্য্য সমপ্রভাম্
তেজঃ স্বরূপাং পরমাং সগুণাঃ নির্গুণাং বরাং ॥
দৃষ্টা তাং কমনীয়াঞ্চ তেজোমণ্ডল মধ্যতঃ।
স্বেচ্ছাময়ীং কৃপারূপাং ভক্তানুগ্রহকাতরাম্ ॥

গ্রীষ্মকালীন স্যূর্য্যের মত প্রভাময়ী মাকে তাঁহারা দেখিলেন। মা তেজস্বরূপা পরমা সগুণা গুণাতীতা—তেজোমণ্ডলের মধ্যস্থা অতীব কমনীয়া। মা স্বেচ্ছাময়ী কৃপাঘন মূর্ত্তি, আর ভক্তজনকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদাই কাতরস্বভাবা।

যথাযথ পূজাদ্বারা মহাশক্তিরূপিণী মা সাক্ষাৎকার হয়েন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। এই পূজাঙ্গকে উপেক্ষা না করিয়া আসুন আমরা সকলে অন্তরে ভক্তিচন্দন ও করে পুষ্পস্তবক লইয়া মাতৃচরণে অঞ্জলি দিয়া প্রাণ খুলিয়া ডাকি—মা! মা।

॥ অকাল-বোধন ॥

"ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া"

দেবতা ও মানুষ। ইহাদের মধ্যে ভেদ বহুবিধ। তন্মধ্যে একটি হইল দিন ও রাত্রির পরিমাপে। মানুষের দিন বার ঘণ্টায়, রাত্রি বার ঘণ্টায়। দেবতার দিবা ছয় মাস, রাত্র ছয় মাস। আমাদের মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস এই ছয় মাস দেবতাদের দিন, শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস দেবতাদের রাত্রি। দেবতাদের দিনকে বলে উত্তরায়ণ। রাত্রিকে বলে দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণে দেবতারা জাগ্রত। দক্ষিণায়ণে তাঁরা নিদ্রিত।

শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়ণের মধ্যে। দেবী ভগবতী তখন নিদ্রিতা। সেইজন্য তখন তাঁহাকে পূজা করিতে হইলে দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করিতে হয়। বসন্ত কাল পড়ে উত্তরায়ণের মধ্যে তখন দেবী জাগরিতা থাকেন। এইজন্য বাসন্তী পূজায় বোধনের আবশ্যক হয় না। শারদীয়া পূজা অকাল পূজা। বাসন্তী পূজা কাল-বোধিত পূজা। অকাল হইলেও পূজা বলিতে শারদীয়া মহাপূজাকেই বুঝায়।

মহারাজ সুরথ করিয়াছিলেন বাসন্তী পূজা। শ্রীরামচন্দ্র করিয়াছিলেন শারদীয়া পূজা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে—

পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
মধুমাসসিতাষ্টম্যাং নবম্যাং বিধি পুর্ব্বকম্॥

আদিতে সুরথ রাজা দুর্গতি নাশিনী দুর্গার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন মধুমাসে শুক্লা অষ্টমী ও নবমী তিথিতে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রবিধিমত। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দুই জনে একত্রিত হইয়া এই পূজা করিয়াছিলেন ঋষির আদেশে। ঋষি বলিয়াছিলেন—

তামুপৈহি মহারাজ ! শরণং পরমেশ্বরীম্
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥ চণ্ডী ১৩।৫

"হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীর শরণ লও। যিনি আরাধিতা হইলে মানুষকে ভোগ স্বর্গ ও মুক্তি প্রদান করেন।"

মায়ের অর্চ্চনা করিয়া সুরথ রাজা ভোগ ও স্বর্গ পাইয়াছিলেন আর সমাধি বৈশ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই বাসন্তী পূজার কাহিনী মূল চণ্ডীতে সংক্ষেপে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে অকাল বোধন করিয়া জগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সেই পূজাই জগতে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের কথা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই। দেবীভাগবত ও কালিকাপুরাণে শ্রীরামের পূজার কথা বিশেষ ভাবেই কথিত হইয়াছে।

অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেবতারা শ্রীরামের মঙ্গল চিন্তায় মহাভাবনায় পড়িলেন। তাঁহারা সকলে স্থির করিলেন রামের জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিবেন। তাঁহারা গিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট মত চাহিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন 'আদ্যা শক্তির

কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত রাবণ-বধ সম্ভব নহে। কিন্তু দেবী ত এখন নিদ্রিতা। তাঁহাকে আমরা প্রবোধিত করিব। কিন্তু কি ভাবে যে প্রবোধিত করিব, তাহাও জননীর নিকট হইতে জানিয়া লইতে হইবে।'

দেবতাগণ ব্রহ্মার সহিত দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্টা হইয়া দেবীর কৌমারী মূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। কৌমারী রূপের বর্ণনা শ্রীচণ্ডীতেই পরিদৃষ্ট হয়—

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ১২।১৫

কৌমারী দেবী কুমার কার্ত্তিকেয়ের শক্তি। তিনি শ্রেষ্ঠ ময়ূরের উপর সমাসীনা, মহাশক্তিধারিণী নিষ্পাপা। তিনি প্রকটিভূতা হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন—'আপনারা আগামী কল্য বিল্ববৃক্ষমূলে জননীর বোধন করিবেন। আপনাদের প্রার্থনায় তিনি বোধিতা হইবেন। জগন্মাতাকে প্রবুদ্ধা করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্য সিদ্ধি হইবে।'

ব্রহ্মা মর্ত্ত্যে আসিলেন। একটি নির্জ্জন স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষ দর্শন করিলেন। তাহার সবুজঘন পত্ররাশির মধ্যে কাঁচা সোনার বর্ণ একটি মনোহারিণী বালিকাকে বিনিদ্রিতা দর্শন করিলেন। ইনিই জগজ্জননী ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া ব্রহ্মা সেখানে দেবগণ সহ নতজানু হইয়া বোধনস্তব করিলেন।

এই স্তবটি একটি অষ্টক—আটটি মন্ত্র আছে। আদি ও অন্ত্যের দুইটি মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে।

জানে দেবীমীদৃশীং ত্বাং মহেশীং
ক্রীড়াস্থানে স্বাগতাং ভূতলেঽস্মিন্।
শত্রুস্ত্বং বৈ মিত্ররূপা চ দুর্গে
দুর্গম্যা ত্বং যোগিনামন্তরেঽপি।

মহাদেবি! তুমিই যে মহেশ্বরী ইহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি। ভূতল তোমার ক্রীড়াভূমি তাই তুমি এখানে আগমন করিয়াছ। তুমি শত্রুরূপাও বটে, মিত্ররূপাও বটে। বন্ধন-কারিণীরূপে তুমি শত্রু। বন্ধনমোচনকারীরূপে তুমি মিত্র। মহাযোগীগণ ধ্যানযোগে অন্তরেও তোমাকে ধরিতে পারেন না।

ত্বং বৈ শক্তী রাবণে রাঘবে বা
রুদ্রেন্দ্রাদৌ ময্যপীহাস্তি যা চ।
সা ত্বং শুদ্ধা রামমেকং প্রবর্ত্ত
তৎ ত্বাং দেবীং বোধয়ে নঃ প্রসীদ।

যেখানে যে শক্তির ক্রিয়া সকলই তোমার। আমি ব্রহ্মা আমার শক্তিও তোমার। রুদ্রদেবতা, ইন্দ্রদেবতা সকলের শক্তিই তোমার। তুমি সর্ব্বশক্তিরূপিণী। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রামের শক্তিও তোমার, রাবণের শক্তিও তোমার। আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি তুমি সকল শক্তি লইয়া শ্রীরামচন্দ্রে প্রবর্ত্তিতা হও। অর্থাৎ সমগ্র শক্তিদ্বারা তুমি শ্রীরামকে সাহায্য কর। জননি, তুমি জাগরিতা হও, এই জন্য বোধন করিতেছি।

ব্রহ্মার স্তবে মহাদেবী প্রবুদ্ধা হইলেন। তিনি তখন তাঁহার বালিকা মূর্ত্তি ছাড়িয়া চণ্ডিকা-রূপে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,

"মাতঃ, আমরা অকালে তোমাকে ডাকিয়াছি, রাবণবধে শ্রীরামচন্দ্রকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। "রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।" দেবী, অদ্য হইতে আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব যাবৎ না রাবণের বধ হয়। "রাবণস্য বধং যাবদ্ অর্চ্চয়িষ্যামহে বয়ম্!" আমরা যে ভাবে বোধন করিয়া তোমার অর্চ্চনায় ব্রতী সেই প্রকারে যুগ যুগ ধরিয়া সমস্ত নরনারী "যাবৎ সৃষ্টি প্রবর্ত্তে" যাবৎ কাল সৃষ্টি থাকিবে, তাবৎ কাল তোমার পূজা করিবে। তুমি কৃপা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রে সর্ব্বশক্তি দিয়া রাবণ বধে সহায়ক হও।"

সদ্য-প্রবুদ্ধা দেবী কহিলেন, "আমি সপ্তমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিব্য ধনুক বাণে প্রবেশ করিব। অষ্টমীতে রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ হইবে। অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণের দশ মাথা মাটিতে লুটাইবে। দশমীতে শ্রীরামচন্দ্র বিজয়োৎসব করিবেন।"

বোধন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত পূজাবিধি দেবী নিজেই জানাইয়া দিলেন। রঘুনন্দন স্মৃতিতে দুর্গোৎসবের সাতটি কল্প বিধান আছে। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প, প্রতিপদাদি কল্প, ষষ্ঠ্যাদি কল্প, সপ্তম্যাদি কল্প, মহাষ্টম্যাদি কল্প, মহানবমী কল্প,। এর মধ্যে বঙ্গদেশে বিহার অঞ্চলে আসামে ষষ্ঠ্যাদি কল্প প্রচলিত।

এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে বিল্ববৃক্ষের শাখায় দেবীর বোধন হয়। তৎপর আমন্ত্রণ ও অধিবাস হয়। ঐদিনকার পূজা হয় ঘটে। পরে সপ্তমী হইতে তিন দিন হয় মৃণ্ময়ী প্রতিমায় পূজা। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্পে ও প্রতিপদাদি কল্পে যথাক্রমে

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমীতে ও আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে দেবীর বোধন হয়। প্রথম কল্পে পক্ষব্যাপী ও দ্বিতীয় কল্পে নবরাত্রি মায়ের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ষষ্ঠ্যাদি কল্পে চারি দিন পূজা হয়।

মহাশক্তির আবির্ভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতা দেবীর উদ্ধার সাধন করেন। মহা বিপদ কাটিয়া গেল বলিয়া অষ্টমীর নাম হইল মহাষ্টমী। মহাসম্পদ লাভ হইল বলিয়া নবমীর নাম মহানবমী।

মহাবিপত্তারকত্বাদ্ গীয়তেঽসৌ মহাষ্টমী।
মহাসম্পদ্দায়কত্বাৎ যা মহানবমী মতা॥

শ্রীরামচন্দ্রের এই দুর্গোৎসবের স্মরণেই আমাদের এই শারদীয়া মহাপূজা। যিনি পূজক তিনি স্থিত শ্রীরামের ভূমিকায়। সংসার,-শ্রমী সাধারণ নরনারীর দারিদ্র্যই মহাবিপদ, ঐশ্বর্য্যই মহাসম্পদ। জীবনযাত্রার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাবিপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া মহাসম্পদ লাভ মায়ের অনুগ্রহেই হইয়া থাকে।

দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা। ৪। ১৭

যাঁহারা যোগী, সাধনাই তাঁহাদের সমর, বিষয়বন্ধনই তাঁহাদের মহাবিপদ, মুক্তি লাভই মহাসম্পদ। জগজ্জননীর অর্চ্চনায় যোগী সাধক সমরে জয়লাভ করেন, তাঁহার ভব-বন্ধন ছেদন হয়। তিনি মুক্তি সুখে ডুবিয়া থাকেন।

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ। ৪।৯

যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক অজ্ঞানতাই তাঁহাদের মহাবিপদ, ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধন। মহাদেবীর অর্চ্চনায় সাধনযুদ্ধে তাঁহারা জয়লাভ করেন কারণ জগজ্জননী নিজেই মূর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী। যাঁহারা ভক্তি-পথের উপাসক তাঁহারা বনবাসী রামচন্দ্রের ভূমিকায় নিরন্তরই ব্যথিত। তাঁহাদের হৃদয়ের ভক্তিরূপিণী সীতা দেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে অপরাধরূপী রাবণ—এই ভাবনা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে বেদনাতুর করে। যোগমায়া কাত্যায়নীর আরাধনায় মহাপরাধরূপী দশাননের বধ হয় মহাষ্টমীতে, প্রেমভক্তিরূপিণী সীতার উদ্ধার হয় মহানবমীতে। দশমীতে এই পরম সত্যানুভূতিকে হৃদয়ের গভীর তলদেশে চিত্তদর্পণে নিরঞ্জন করিয়া ভক্ত সাধক বিশ্বমানবকে ভাই বলিয়া কণ্ঠআলিঙ্গন করেন।

মানব-সভ্যতা আজ ভোগমুখী। ভোগসুখিনতাই অকাল। আমাদের অকাল-বোধন সফল হউক। বৃক্ষের পরিচয় ফলে। বিশ্ব-মাতার পূজার পরিচয় বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের প্রসারতায়। মহাপূজার আয়োজনে উৎসব-মুখর আমাদের জীবন আকাশের মত উদার হউক—বাতাসের মত স্নিগ্ধ মধুর হউক।

মহাপূজার উপচার

ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার যতপ্রকার উপায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে তন্মধ্যে পূজা সর্বশ্রেষ্ঠ। পূজা তন্ত্রশাস্ত্রের এক অভিনব দান। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে এই অনুষ্ঠানের অনুরূপ অনুষ্ঠান নাই। পূজা কথাটির ঠিক অনুবাদ অন্য ভাষায় চলে না। পুষ্প চন্দনাদি কতিপয় বিশিষ্ট উপচার লইয়া দেবতার সঙ্গে যে এক অভিনব প্রকারের ব্যবহার তাহাই আমাদের পূজা। শ্রীভগবানের সান্নিধ্য লাভের ইহা এক শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পুর্বেও বলা হইয়াছে ঈশ্বর ও মানবের সম্বন্ধ স্থাপনের বৈদিক উপায় হইল যজ্ঞ। পূজানুষ্ঠান হইল তন্ত্রশাস্ত্রের নিজস্ব সম্পদ। যুগ-যুগ ধরিয়া এই অনুষ্ঠানটিকে ভারতীয় ধর্মের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। পুজায় দুইটি বস্তুর প্রাধান্য, মন্ত্র ও উপচার। এই নিবন্ধে কেবলমাত্র উপচারের কথাই বলিব। যে সকল উপচার দ্বারা যেভাবে ঐ কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয় তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। মন্ত্র-রহস্য বা প্রয়োগবিধি বলা সম্ভব নহে।

পুজায় বাহ্য ও আন্তর দুইটি দিক। উভয়েরই মূল্য সমান। কাহারও কাহারও ধারণা, বাহ্য পূজা হইতে মানস-পূজা শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নাধিকারীই বাহ্যপুজা করিবে। এই ধারণা ঠিক নহে। মূলতঃ বাহ্য-পুজাই পুজাপদবাচ্য। বাহ্য-পুজায় অসমর্থ ব্যক্তিকেই

মানসপূজা করিতে বলা হইয়াছে। বাহির পূজা ত্যাগ করিয়া অন্তরের পূজার বিধি নহে। বস্তুতঃ অন্তর বাহির দুই মিলিয়াই সমগ্র পূজা। মানবদেহের যেমন হস্ত-পদাদি অঙ্গ, প্রাণশক্তি অঙ্গী। পূজারূপিণী দেবী-দেহেরও সেইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক উপচার সমর্পণ হইল অঙ্গ, অন্তরের অনুরাগ হইল অঙ্গী। এই নিবন্ধে প্রধানতঃ অঙ্গের কথাই বলিব।

বহুদিন যাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছি, এইরূপ কোন অতীব প্রীতির পাত্র, অথচ মর্যাদাসম্পন্ন নিতান্ত নিজ জন যদি আমাদের গৃহে আসিয়া উনীত হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে যেভাবে গ্রহণ করি, সেই ভাবটি লইয়াই দেবতার পূজা। উপচার সকলও সেই ভাব লইয়াই নির্ণীত হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের কত আপন জন, কত প্রেমের পাত্র, অথচ তিনি কত বড় বিরাট বস্তু! আজ তিনি আমাদের দুয়ারে নামিয়া আসিয়াছেন তাঁহার দিব্যধাম হইতে, তাঁহাকে সম্মান করিতে হইবে, সম্বর্ধনা করিতে হইবে, পরম যত্ন সেবা করিতে হইবে। আমাদের নিজেদের যেরূপ স্নান, আহার, বিশ্রাম প্রয়োজন তাঁহারও সেই রকমই দরকার এই বোধে আত্মবৎ যে পরিচর্য্যা, তাহাই পূজার প্রধান দিক।

সকল দেবতার পূজার অঙ্গই মূলতঃ একপ্রকার। পূজায় যদি মহাস্নান থাকে ও বলি হোম থাকে, তাহা হইলে সেই পূজাকে মহাপূজা কহে। আমাদের শারদীয়া দুর্গোৎসব একটি মহাপূজা। পূজার সময় আমরা অনেকেই পুরোহিতের উপর পূজার ভার ন্যস্ত করিয়া নিজেরা অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি। পূজামণ্ডপে বসিয়া মহাস্নান হোমাদি দর্শন করি না। দর্শন

করিলে অনুভব করিতে পারা যায় যে, ঐ সকল অনুষ্ঠান কত বিচিত্রতাময় ও গম্ভীরার্থদ্যোতক। মায়ের মহাপূজার কথাই বলিব।

পূজার উপচার সামর্থ্যানুসারে পঞ্চবিধ, দশবিধ বা ষোড়শবিধ হইতে পারে। মহাপূজায় ষোড়শোপচারই বিধি। বিভিন্ন গ্রন্থোক্ত নির্ঘণ্টে উপচারগুলির নামে অল্পবিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। মহানির্বাণ তন্ত্রে ষোড়শ উপচারের নাম নিম্নরূপ—

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং,
মধুপর্কং তথামচ্য স্নানীয়ং বস্ত্রভূষণৈঃ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে নৈবেদ্যং বন্দনং তথা
দেবার্চনাসু নির্দিষ্ট উপচারশ্চ ষোড়শ॥

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, ভূষণ, গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ, নৈবেদ্য ও চন্দন এই ষোলটি পূজার উপচার।

সর্বাগ্রে আসন প্রদান। স্বর্ণাসন, কাষ্ঠাসন, বস্ত্রাসন, কুশাসন —যেটি সামর্থ্যে কুলায় তেমনি আসন দেওয়া যাইতে পারে। এসকলের অভাবে কুশাসন অর্পণ করা চলে। একটিমাত্র পুষ্প হাতে লইয়া 'মা এই তোমার আসন হউক বলিয়া অর্পণ করা যায়। "আসনং গৃহ্ণ চার্বাঙ্গি" এই মর্মে মন্ত্র আছে। মন্ত্রসহ আসন সমর্পণ কর্তব্য।

আসন প্রদান করিলেই মা বসিবেন না। "স্বাগত" জানাইতে হইবে। লৌকিক আসুন, এই যে আসুন, ইত্যাদি বলিবার মত,

ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইত্যাদি মন্ত্র মুদ্রাসহযোগে জগজ্জননীকে যথাস্থানে উপবেশন করানই স্বাগতং। বীজমন্ত্রসহ স্বাগতং সুস্বাগত ইত্যাদি বিনয় বাক্য উচ্চারণ পূর্বক এই কার্য করিতে হয়।

মাতা আসন প্রতিগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলে তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালনের জন্য জল দিতে হয়। তাহাই পাদ্য। পাদ্যের পর অর্ঘ্য। অর্ঘ্য রচনা করিতে আটটি দ্রব্যের প্রয়োজন—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, অক্ষত, তিল, যব ও শ্বেতসর্ষপ। "গৃহাণ অর্ঘ্যং হরপ্রিয়ে" ইত্যাদি নির্দিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মাতাকে অর্ঘ্যার্পণ করিতে হয়। অতঃপর শ্রীমুখ প্রক্ষালনের জন্য আচমনীয় প্রদেয়। শুদ্ধ জল দ্বারাই আচমনীয় দেওয়া হয়। কর্পূর ও সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত জল দিবার বিধিও আছে।

মা আসিয়াছেন, সন্তানের জন্য বহু পথ অতিক্রম করিয়া, তাই তাঁহার পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্য একটি শীতল সুস্বাদু পুষ্টিকর পানীয় অর্পণ করিতে হইবে। ওটির শাস্ত্রীয় নাম মধুপর্ক। পরিমাণ মত পাঁচটি দ্রব্য মিশ্রণে মধুপর্ক তৈয়ারী হয়। দধি, ঘৃত, জল মধু ও চিনি। কোন কোন মতে নারিকেলের জলও মিশাইতে হয়। ইহা কাংস্যপাত্রে অর্পণ করিতে হয়। মধুপর্ক সৌখ্য ভোগ্য পুষ্টি তুষ্টি প্রদায়ক। মধুপর্ক অর্পণের পর পুন-রাচমনীয় দেওয়া বিধি। মায়ের ক্লান্তি দূর হইলে স্নানীয় দ্বারা স্নান করাইতে হয়। মহাষ্টমীতে মায়ের যে স্নান তাহাকে মহাস্নান বলা হয়। প্রথমে তৈল হরিদ্রা প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা অভ্যঙ্গ ও পঞ্চশস্যচূর্ণ দ্বারা গাত্রমার্জন করণীয়। অতঃপর নানাবিধ

জলের দ্বারা স্নান করাইতে হয়। তেত্রিশ প্রকার জলের মধ্যে কতিপয় নাম করা যাইতেছে।

শুদ্ধজল, গঙ্গাজল, সুগন্ধজল, শীতলজল. ঈষতুষ্ণজল, কুশ-যুক্তজল, স্বর্ণজল, রজতজল, মুক্তাজল, নারিকেলজল, তিলযুক্ত-জল, সর্বৌষধি জল, মহৌষধি জল, অগুরুজল, পুষ্পযুক্ত জল, শিশিরের জল, বৃষ্টির জল, চন্দনজল, শর্করাযুক্ত জল, পুষ্করিণীর-জল, সহস্রধারা জল। ইহা ছাড়া পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, পঞ্চশস্য ও অষ্টবিধ মৃত্তিকাযুক্ত জল ও বিষ্ণুতৈল প্রভৃতি মায়ের মহাস্নানে অর্পিতহয়। সর্বশেষে অষ্ট কলসী জলে স্নান হয়। এই স্নান করান —দেবতাগণ আকাশ গঙ্গার জলে, মরুৎগণ বৃষ্টির জলে, বিদ্যাধরগণ নদীর জলে, লোকপালগণ সমুদ্রের জলে, নাগগণ পদ্মরেণু জলে, পর্বতগণ নির্ঝরের জলে, সপ্তর্ষিগণ সর্বতীর্থ জলে ও অষ্টবসু চন্দনবাসিত জলে।

এই মহাস্নান কালে অষ্টবিধ বাদ্য বাজিবে, অষ্টবিধ রাগিণী গীত হইবে। এই সকল বাদ্য ও রাগরাগিণীর নামও শাস্ত্রে লিখিত আছে। মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ঐ সকল দ্রব্যাদি দ্বারা মাতাকে স্নান করাইতে হয়। প্রত্যেকটি বস্তু দ্বারা স্নান করাইবার মন্ত্র পৃথক। অষ্ট কলসী জলে স্নানের আটটি মন্ত্র পৃথক ও বিশেষ প্রাণস্পর্শী। মনে হয় অনন্ত বিশ্বের সকলে মিলিয়া জগন্মাতার মহাঅভিষেক করিতেছেন।

স্নানের পর জননীকে পরিধেয় বস্ত্র অর্পণ করিতে হয়। সন্তান তাহার সাধ্যানুসারে মাকে কার্পাস বস্ত্র বা কৌষেয় বস্ত্র বা আরও

মূল্যবান বস্ত্র অর্পণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রার্থনা করিয়া মাকে বস্ত্র নিবেদন করিতে হয়। জননী বসন গ্রহণ করিলে ভূষণ দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে হয়। মায়ের নয়টি অঙ্গে আবরণ দিতে হয়—চরণ, কটি, বক্ষ, হস্ত, কণ্ঠ, নাসিকা, কর্ণ, সীমন্ত ও মস্তক। নূপুর হইতে আরম্ভ করিয়া মুকুট পর্যন্ত ভক্ত সামর্থ্যানুযায়ী মাতৃঅঙ্গ আভরণযুক্ত করেন। অক্ষম হইলে মানসে ঐরূপ সুসজ্জিতা জননীকে দর্শন করেন।

স্নানান্তে জননীকে অনুলেপনের জন্য অগুরু-চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অর্পণ করিতে হয়। তারপর চন্দনযুক্ত পুষ্প মায়ের পাদপদ্মে দিতে হয়। ইহাই পূজার প্রধান অঙ্গ। শ্রীগীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন অর্জুনকে,—পত্র-পুষ্প-ফল-জল ভক্তিপূর্বক আমাকে দিলে, আমি তাহা গ্রহণ করি। মায়ের পূজায় বিল্বপত্র ও জবা পুষ্পাদি সর্বশ্রেষ্ঠ। তা ছাড়া মা নাগকেশর, বকুল, কুন্দ, করবী, আকন্দ, শ্বেতপদ্ম, রক্তপদ্ম প্রভৃতি ফুল ভালবাসেন। শ্বেত ও রক্ত-চন্দনযুক্ত পত্রপুষ্প মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মায়ের পায়ে দিতে হয়—তৎসহ ভক্তি ও অনুরাগযুক্ত আপনার হৃদয়-পদ্মও ঐ শ্রীচরণপদ্মে অর্পণ করিতে হয়। অনন্তর ধূপ ও দীপ। ধূপ শব্দের নির্বচন আচার্যেরা কহেন—অশেষ দোষ 'ধূত' অর্থাৎ বিনাশ করেন এবং পরমানন্দ প্রদান করেন এই হেতু ধূপ নাম সার্থক। ধূপের ধূম আরামদায়ক হইবে। কখনও এমন হইবে না যাহাতে মায়ের চক্ষের জ্বালা হইতে পারে—"নাসাক্ষিরন্ধ্র সুখদ" হইবে। খুব তাপও হইবে না—'নিস্তাপ' হইবে। ষড়ঙ্গ ধূপ, ষোড়শাঙ্গ ধূপ ইত্যাদি বহুবিধ ধূপ প্রস্তুত-প্রণালী শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ

ধূপে গুগ্‌গুল, চন্দনের গুঁড়া প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয়। মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক মাকে ধূপ-ধূম অর্পণ করিতে হয়।

তৈল বা ঘৃতযুক্ত দীপদান প্রশস্ত। প্রাণীর অঙ্গজাত দ্রব্যে দীপদান নিষিদ্ধ। দীপটি হইবে নেত্রের আনন্দদায়ক। দীপে খুব তাপ হইবে না (দূরতাপ বিবর্জিত), দীপ শব্দশূন্য ও ধূমশূন্য হইবে। পলিতা খুব সরু বা খুব মোটা হইবে না। দীপটি কিছু উচ্চস্থানে রহিবে যেন বসুমতার অঙ্গে তাপ না লাগে।

মাতঃ, তোমার জ্যোতিঃই অগ্নিকে তেজস্বী করিয়াছে, তোমার জ্যোতিঃতেই সূর্য্য চন্দ্র জ্যোতিষ্মান্—তবু মা, তোমাকে এই ক্ষুদ্র দীপ দিতেছি---গ্রহণ কর—'ওঁ অগ্নিজ্যোতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মাকে দীপ দিতে হয়। তৎসহ নিজ ক্ষুদ্র জীবনদীপটিও ঐ ভাবে স্নেহময় করিয়া অর্পণ করিতে হয়।

পূজার ভোগের নাম নৈবেদ্য। মা এখন আহার করিবেন। ভক্তের নিজের যাহা প্রিয়, তাহাই সে মাকে দিবে। "মনঃ প্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং"। বালকের প্রিয় দ্রব্যাদি মা ভালবাসেন। "স্ত্রীণাং প্রীতিকরং" দ্রব্যাদি মায়ের প্রীতিপদ। শাস্ত্রে নৈবেদ্যের উপকরণের যে কত বর্ণনা তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। কালিকা পুরাণে উপকরণের বিস্তৃত নির্ঘণ্ট আছে।

ঘৃতযুক্ত শালিধানের অন্ন, মাষ, মুদ্গ, তিল, পরমান্ন, পিষ্টক, কৃশর (খিচুড়ি), মোদক, পৃথুক (চিঁড়া), ধানা (মুড়কী), দ্রাক্ষা, পনস, খর্জুর, শ্রীফল, ব্রাহ্মী, কলমী, পুনর্নবা প্রভৃতি শাক, দধি দুগ্ধ, ঘৃত, নবনী, শর্করা, মধু, ইত্যাদি সন্তান যাহা দিবেন মাকে ভক্তি করিয়া মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন। কোন দ্রব্য

ভক্তের মাকে দিতে ইচ্ছা কিন্তু তাহা দুর্লভ—তখন 'তৎ কল্পনায়ং মনসা' উহা মনে মনে ভাবনা করিয়া দিবে। নিতান্ত দীন-দরিদ্র সন্তান মাকে কিছুই দিবার মত নাই তার ঘরে, সে কি করিবে—মনে মনে ধ্যান করিয়া সর্ববিধ দ্রব্য কল্পনা করিয়া নৈবেদ্য সাজাইবে, করুণাময়ী মা তাহাই সাদরে গ্রহণ করিবেন।

মা ভোগ গ্রহণ করিলে ভক্ত শ্রীচরণ বন্দনা করেন। এই বন্দনাটি অতি মূল্যবান। আচার্যেরা বলেন, সকল দ্রব্য দিয়াও যদি প্রণতিটি ভক্তিপূর্ণ না হয় তবে সকলই বিফল হয়। কিছু না দিয়াও কেবলমাত্র ভক্তিপূর্ণ একটি নমস্কারে পূজা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে। 'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে, আমার সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার চরণ'পরে।' গীতায় শ্রীভগবানও অর্জুনকে কহিয়াছেন—'মাং নমস্কুরু'। আমরাও মাকে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' শত-সহস্র প্রণতি জানাই। দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, সব এক করিয়া সমস্ত সত্তাটাকে মায়ের পায়ে ফেলিয়া দেওয়াই হইল শ্রেষ্ঠ প্রণাম। বন্দনাই ষোড়শ উপচারের শেষ উপচার।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ষোড়শোপচারে পূজা, মহাস্নান সঙ্গে যদি বলি ও হোম থাকে, তাহা হইলেই ঐ পূজা মহাপূজা হয়। পূজা ও মহা-স্নানের কথা বলা হইল। বলি ও হোম সম্বন্ধে দুটি কথা মাত্র বলিব। 'বলি' শব্দের অর্থ হইল উপহার। মায়ের শ্রীকরে কিছু উপহার দিতে হইবে। সুরথ রাজা "নিজ গাত্রাসৃক্-গুক্ষিতং" দ্রব্যাদি দিয়াছেন। নিজ গায়ের রক্তমাখা দ্রব্যাদি। আমরা কথায় বলি "গায়ের রক্ত" অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু, বহু কষ্টার্জিত বস্তু মাকে দিতে হয়।

যাঁহারা রাজসিক বা তামসিক পূজা করেন, তাঁহারা বলির দ্রব্য বলিতে বুঝেন একটি নিরীহ চতুষ্পদ প্রাণী। যাঁহারা সাত্ত্বিক তাঁহারাও একটি চতুষ্পদ প্রাণী আনেন—ঐ প্রাণীটির পা হইল—মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। এই চতুষ্পদ বিশিষ্ট নিজ অন্তঃকরণটি তাঁহারা মাকে দিয়া দেন। ভক্ত সাধকের গান আছে।—

ধর্মাধর্ম দুটো অজা তুচ্ছ খোটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ
তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।

হোম বৈদিক বিধি। মহাপূজায় বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধির একাত্মতা হইয়া গিয়াছে। অগ্নিমুখে সকল দেবতার উদ্দেশে আহার্য অর্পণ করিতে হয়। এই অর্পণটি পূর্ণ হয় যখন সাধকের ভাবনায় গীতার বাণী সজীব হইয়া উঠে।—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ৪।২৪

অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতাগ্নি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ কর্মে একাগ্রচিত্ত পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মময়ী মা-ই সব। হোমের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাতৃময়। মায়ের স্নেহের অনলে সাধকের জীবনাহুতি হইলেই হোমাঙ্গ পূর্ণ হয়! মায়ের সন্তানের সেবায় জীবনকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া হোমাঙ্গ সার্থকতা প্রাপ্ত হয়।

জগজ্জননীতে মাতৃভাব ও মায়ের সকল সন্তানে ভ্রাতৃভাবের বিকাশে আমাদের মহাপূজা জীবন্ত হইয়া উঠুক।

বরদাত্রী

দুর্গা সপ্তশতী চণ্ডীগ্রন্থে মেধস ও সুরথসমাধি সংবাদ

অনেক শাস্ত্রগ্রন্থই অনুরূপ সংবাদ বা বক্তাশ্রোতার কথোপকথনরূপে প্রকটিত আছেন। গীতা, কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। ভাগবৎ শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ। মহাভারত বৈশম্পায়ন-জন্মেজয়-সংবাদ। এই সংবাদের পরে আবার সংবাদ থাকে। যেমন গীতা কৃষ্ণার্জ্জুনের আলোচনা তাহাই পুনরায় সঞ্জয় ও ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ। তাহাই পুনরায় বৈশম্পায়ন-জন্মেজয়সংবাদ। ইহাকে গীতার ষট্-সংবাদ বলে। চণ্ডীরও ষট্-সংবাদ আছে। সুরথ সমাধি মেধস মুনির কাছে যাহা শ্রবণ করেন সেই কথা মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরি মুনিকে (মতান্তরে তোঁষ্টুকি) বলেন। তারপর সেই কথাই আবার পক্ষীরূপী মুনিপুত্রগণ জৈমিনিকে কহিয়াছেন। ইহা চণ্ডীর ষট্-সংবাদ।

চণ্ডীর মুখ্য তত্ত্ববিষয়টির মেধস মুনি বক্তা, সুরথ ও সমাধি শ্রোতা। গীতা, ভাগবত, মহাভারত সর্ব্বত্রই কিন্তু একজন শ্রোতা—যথাক্রমে অর্জ্জুন, পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়। চণ্ডীর শ্রোতা দুই জন। দুই জন মুখ্য শ্রোতার শাস্ত্রীয় প্রয়োজনীয়তা কি গ্রন্থের শেষ (ত্রয়োদশ) অধ্যায়টি পর্য্যন্ত না পাঠ করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

চণ্ডীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ঋষিবর সুরথ সমাধিকে মায়ের আরাধনা করিতে নির্দ্দেশ দিলেন। তাঁহারা নিজেদের তৈয়ারী করিয়া তিন বৎসর কাল কঠোর সাধনা করেন। পূজায় জননী সাক্ষাৎকার হইয়া বলিলেন, তোমরা বর প্রার্থনা কর।

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।
যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ।

যাহা প্রার্থনা কর আমার কাছে পাইবে। আমি তোমাদের প্রতি পরিতুষ্টা হইয়াছি। তখন রাজা বর কামনা করিলেন—

ততো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ॥

অবিভ্রংশি অর্থাৎ বিভ্রংশরহিত নিষ্কণ্টক। আমি এমন রাজ্য কামনা করি যাহা কেহ কখনও কাড়িয়া লইতে না পারে। এই রূপ রাজ্য আমি পরজন্মে কামনা করি। আর এই জন্মে চাই স্বীয় রাজ্য যাহা হারাইয়াছি। সেই হৃতরাজ্য যেন নিজ বলে শত্রু নাশ করিয়া লাভ করি। ক্ষত্রিয়োচিত পরাক্রমে শত্রুগণকে পদানত করিয়া নষ্ট রাজ্যপুনরুদ্ধারের জন্য শক্তি কামনা করি। ইহকালে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের শক্তি ও পরকালে অবিভ্রংশি রাজ্যে স্বর্গলাভ এই রাজার যাচ্ঞা।

জগজ্জননী বলিলেন—

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি।

মৃতশ্চ ভূয়ঃ সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ।
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান ভুবি ভবিষ্যতি।
(চণ্ডী ১৩।২০-২৬)

অর্থাৎ, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি শত্রু বিনাশ করিয়া নিজ রাজ্য লাভ করিবে। আর পরজন্মে সূর্য্যদেব হইতে পুনর্বার জন্ম লাভ করিয়া তুমি পৃথিবীতে সাবর্ণি মনু হইবে। সেই রাজ্য আর কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সাবর্ণিমন্বন্তরে তুমি হইবে মন্বন্তরাধিপ। সমাধি বৈশ্য বর চাহিলেন।

সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্॥

বৈশ্য চাহিলেন জ্ঞান। জ্ঞানং বব্রে। যেরূপ জ্ঞান দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হয় সেইরূপ জ্ঞান। বৈশ্যবরের ভাষায় বলি মম এবং অহং—আমার ও আমি এই যে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি—এই আমার স্ত্রী, এই আমার সাধের দেহ, এই যে মিথ্যা অভিমান তাহার বিচ্যুতি বিশেষভাবে ঘটাইবার কারক যে জ্ঞান। দেহ-দৈহিক ভোগাসক্তি-নাশকারী যে জ্ঞান তাহাই কামনা করিলেন।

রাজার মত ভোগসুখ না চাহিয়া বৈশ্যবর এইরূপ জ্ঞান চাহিলেন কেন? তাহার কারণ ঋষিবর বলিয়াছেন বৈশ্যবর্য্যের দুইটি বিশেষণ দিয়া।—নির্ব্বিণ্ণমানস এবং প্রাজ্ঞ।

নির্ব্বিণ্ণ অর্থ বিরক্ত। বিষয়-সুখে বিরক্ত হইয়াছে মন যার সেই নির্ব্বিণ্ণমনা। সমাধি বৈশ্যের অন্তঃকরণে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বৈষয়িক সুখে বিরক্তি জাগিয়াছে। কেন জাগিল তাহার কারণ তিনি প্রাজ্ঞ অর্থ সারাসার বিবেকবান। চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ ফলে তাঁহার চিত্তে কোনটি সার বস্তু কোনটি অসার বস্তু এই অনুভূতি জাগ্রত হইয়াছে। বিবেকবান ব্যক্তিই প্রাজ্ঞ। প্রকৃষ্ট জ্ঞানশালী। বৈশ্যবরকে বর দিতে মাতা বলিলেন—

বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি॥

হে বৈশ্যবর! তুমি আমার নিকট যে বর পাইতে অভিলাষ করিয়াছ তাহাই দিব। সম্যক্ সিদ্ধি অর্থাৎ পরামুক্তির জন্য প্রয়োজন যে জ্ঞানের সেই জ্ঞান তোমার লাভ হইবে। পরা-মুক্তির জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মজ্ঞানের। সমাধি সেই জ্ঞান লাভ করিলেন।

ইহাতে স্পষ্ট হইল যে মহামায়া সুখদা ও মোক্ষদা এই দু-ই বটেন। দুইজন শ্রোতার চণ্ডী শ্রবণের রহস্য ব্যক্ত হইল। বিষয়সুখ ও মোক্ষসুখ ছাড়া আরও একটি পরম সম্পদ মহা-শক্তি প্রদান করিতে পারেন। সেটি দান করেন অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া রূপে। দেয় সম্পদটি হইল শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম ভক্তি। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত শ্রীবৃন্দাবনে।

বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য যোগমায়া দেবীর পূজা করিয়াছিলেন।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দ-ব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্॥

হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে নন্দব্রজবাসিনী গোপবালাগণ হবিষ্যান্ন ভোজনাদি নিয়মপালন পূর্ব্বক কাত্যায়নীব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

তাঁহারা কি মন্ত্রে নিত্য পূজা করিতেন তাহা শ্রীভাগবত উল্লেখ করিয়াছেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

হে দেবি কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, হে মহাযোগশক্তিশালিনী, হে সমগ্র লীলার অধিশ্বরী আপনি নন্দগোপীসুতকে আমাদের পতি করিয়া দিউন। আপনাকে প্রণাম।

এই মন্ত্র জপ করিয়া তাঁহারা যোগমায়া দেবীর অচর্চনা করিয়াছিলেন মাস ভরিয়া। এই অর্চনা তাঁহাদের গভীর কৃষ্ণ-প্রেমের পরিচায়ক। এই প্রেমবলে ও যোগমায়া দেবীর অশেষ করুণাবলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন এবং জগৎপতিকে তাঁহারা প্রাণপতিরূপে আপন জন করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

মহামায়া কেবল ভোগসুখ ও মোক্ষ-সুখের দাত্রী নহেন, শ্রীহরিচরণ কমলে প্রেমভক্তি ধনেরও তিনি প্রদাত্রী। যে স্বরূপে এই প্রেমভক্তিধন দান করেন, শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছায় উহা শ্রীবৃন্দাবনে নন্দপত্নী যশোদার গৃহে প্রকটিত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই অবতারের কথা মূল চণ্ডী-গ্রন্থেই উক্ত আছে।

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভব।"

এই স্বরূপকে শ্রীমদ্ভাগবত 'একানংশা' 'কৃষ্ণানুজা' প্রভৃতি নানা পরিচয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, ইনি অন্তরঙ্গা শক্তি—চিচ্ছক্তিবৃত্তি স্বরূপভূতা। যে শক্তি দেহাভিমানী জীবকে আবরণ করেন সেই বহিরঙ্গা শক্তি ইনি নহেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্বপরিণতি
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন ভক্তগণের গূঢ়ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

নিত্যলোক হইতে লীলাকে প্রপঞ্চে প্রকট করাইতে ইনি মহাসামর্থ্যশালীনি। এই স্বরূপে তিনি ভক্তিদাত্রী।

দেবগণ স্তবে মাকে "সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। সকলের সকল প্রকার আর্ত্তিকে তিনি হরণ করিয়া থাকেন। যিনি ভোগী তার অন্তরে নিয়ত ভোগকামনা। ভোগ্য বস্তু পাইবার জন্য তার আর্ত্তি—মাতা এই আর্ত্তি হরণ করেন। যিনি যোগী তিনি মুক্তি কামনা করেন। মুক্তি না পাওয়ার জন্য তার অন্তরে আর্ত্তি জাগে। জগজ্জননী সেই আর্ত্তিকে দূর করেন। যাঁহারা সত্য সত্যই ভোগ বা মুক্তি কিছুই চান না, তাঁহারা শুদ্ধ ভক্তি-যোগী। তাঁহারা কেবল চান শ্রীকৃষ্ণ চরণে নির্ম্মল শুদ্ধাভক্তি। ইহা পাওয়ার জন্য অপ্রাপ্তিজনিত আর্ত্তি তাঁহাদের অন্তরে জাগিয়া থাকে। বিশ্বকবির ভাষায়—

যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।

এই আর্ত্তি দূর করিয়া মহাদেবী তাঁহাদের হৃদয়ে সুদুর্লভ প্রেমভক্তি মহাসম্পদ দান করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দর মা কালীর কাছে প্রার্থনায় বলিয়াছেন—

এস মা পাগলা কালি
লয়ে প্রেমের ডালি
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
তুমি গণপতি অংশুমালী।

আদ্যাস্তবেও দেখা যায়—

সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী।

সর্ব্বার্ত্তিহারিণী সর্ব্ববিধবরদাত্রী হরিকৃপারূপিণী জগজ্জননী মহাদেবী জয়যুক্তা হউন। মাতৃকরুণার প্লাবনে বিশ্বচরাচর ধন্য হউক। আমরা তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিপূর্ণ প্রণতি জানাই।

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

প্রস্থানত্রয় ও দেবীমাহাত্ম্য

প্রস্থানত্রয় বলিতে বেদ বেদান্ত ও গীতাকে বুঝায়। বস্তুতঃ বেদ বেদান্ত গীতাই মুখ্যশাস্ত্র। অন্যান্য শাস্ত্র ইহাতে প্রকাশিত সত্যেরই বিভিন্নমুখী অভিব্যক্তি। বেদ বেদান্ত ও গীতাতেও মূলতঃ একটি তত্ত্বেরই ত্রিমুখী বিকাশ। বেদকে বলে শ্রুতিপ্রস্থান —ইহা অনাদিসত্য। কেহ নির্ম্মাণ করে নাই। গুরু-শিষ্য-পরম্পরা অনাদিকাল ধরিয়া শ্রুত হইয়া আসিতেছে। ইহা অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার।

গীতাকে বলে স্মৃতি-প্রস্থান। শ্রুতির সত্যই মানবীয় জীবন-স্মৃতির মধ্যে, লৌকিক ইতিহাসের মধ্যে, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদের মাধ্যমে প্রকটিত হইয়াছে স্মৃতিপ্রস্থান গীতাগ্রন্থে। বেদান্তসূত্রকে বলে ন্যায়-প্রস্থান। শ্রুতি ও স্মৃতির সত্যই ইহাতে ন্যায়ানুমোদিত ভাবে বাদবিচার ও তর্কের মাধ্যমে সুসিদ্ধান্তরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। যাহা শ্রুত হইয়া আসিতেছে ঋষিগুরুপরম্পরায়, দৃষ্ট হইয়াছে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের মধ্যস্থলে তাহাই পুনরায় যুক্তি-মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বেদান্তদর্শনে। এই প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের সম্বন্ধ কি তাহাই এই নিবন্ধে সংক্ষেপে আলোচ্য।

প্রস্থানত্রয় জ্ঞানশাস্ত্র। চণ্ডী বিজ্ঞানশাস্ত্র। জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিরোধিতা নাই। একই সত্যানুসন্ধিৎসা ও একবাক্যতা আছে।

জ্ঞানশাস্ত্রে নির্ম্মল সত্য (Pure Truth) বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রযুক্ত সত্য (applied Truth) জ্ঞানের দ্বারা আনীত সত্য বিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা স্থাপন করে। বেদাদি শাস্ত্রের মহাসত্য চণ্ডী আধ্যাত্মিক পরীক্ষা অর্থাৎ সাধনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বেদগীতার মন্ত্র ও বেদান্তের সূত্র চণ্ডীতে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

বেদের একটি বিখ্যাত সূক্তের প্রকট প্রতিমা দেবী দুর্গা একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী যে মন্ত্রের দর্শন করিয়া ব্রহ্মাবাদিনী ঋষি হইয়াছেন সেই দেবীসূক্তের উজ্জ্বল বিগ্রহই শ্রীশ্রীমহাদেবী চণ্ডিকা। দেবীসূক্ত ও সপ্তশতী পাঠ করিলেই উহা হৃদয়ঙ্গম হয়। দেবীসূক্ত মধ্যেই চণ্ডীর বীজ নিহিত আছে। এই জন্যই দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের পূর্বে দেবীসূক্ত পাঠ করিতে হয়। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দেবীসূক্ত জপ করিয়াই মায়ের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবী সাক্ষাৎকার হইয়াছিলেন। দেবীসূক্তে যিনি মন্ত্ররূপা, দেবীমাহাত্ম্যে তিনি বিগ্রহরূপা। ইহা দ্বারা বেদ ও চণ্ডীর একাত্মতা প্রতিপন্ন হয়।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আম্নাত হইয়াছে—

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ
একমেবাদ্বিতীয়ম্ ৬।২।১

ব্রহ্ম বস্তু আদিতে এক এবং অদ্বিতীয় ছিলেন। পরবর্ত্তী তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে

তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ৬।২।৩

আমি বহু হইয়া প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব এইরূপ ইচ্ছা করিলেন

ব্রহ্ম। এক বস্তু বহু হইলেন। কিরূপে এই ইচ্ছা পূর্ণ হইল তাহা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি স্পষ্টতর করিয়া কহিয়াছেন

য একোবহুর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ, ৪।১

তিনি "শক্তিযোগে" বহুরূপ হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর পরবর্ত্তী ৬।৮ মন্ত্রে কহিয়াছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥

সুতরাং শক্তি দ্বারাই যে তিনি বহুরূপ হইয়াছেন ইহা শ্রুতিতে সুস্পষ্ট। এই পরাশক্তি পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি। ইহা দ্বারা বোঝা গেল যে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। যে শক্তি আগন্তুক তাহা ঔপাধিক অর্থাৎ ভেদবিশিষ্ট। যে-শক্তি স্বাভাবিক তাহা স্বরূপভূতা, অভিন্ন। যেমন ধূমযুক্ত অগ্নি ও দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নি। ধূমযুক্ততা অগ্নির আগন্তুক বা ঔপাধিক বৈশিষ্ট্য। ইন্ধনের আর্দ্রতারূপ উপাধি থাকিলেই অগ্নির ধূমযুক্ততা। ইন্ধনের আর্দ্রতা না থাকিলে—একটা লাল তপ্ত লৌহদণ্ডে ধুমের অভাব। ইহাতে বোঝা গেল ধূমযুক্ততা অগ্নির আগন্তুক ধর্ম্ম। অতএব উহা অগ্নি হইতে পৃথক। যদিও অগ্নি ছাড়া ধূম থাকিতে পারেনা তবু ধূম ছাড়া অগ্নি থাকিতে পারে।

আর দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, দাহনকার্য্য ছাড়া অগ্নির স্থিতির সম্ভাবনা নাই। দাহ্য ফুরাইয়া গেলে সে বসিয়া থাকিবে না, অমনি চলিয়া যাইবে। সুতরাং দহন শক্তি আর অগ্নি অভিন্ন। যে শক্তি-যোগে ব্রহ্ম বহু হন—উহাকে

পরা শক্তি ও স্বাভাবিক শক্তি—উহা যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ইহাই বলা হইল। এই শক্তিই দেবীমাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত মহাশক্তি দুর্গা। সুতরাং বেদের ব্রহ্মতত্ত্বে ও চণ্ডীর দুর্গাতত্ত্বে ভেদের অবকাশ নাই। সৃষ্টির বৈচিত্র্যকারিণী এই মহাশক্তি প্রধানতঃ বল ও ক্রিয়ারূপা।

কঠ শ্রুতিতে উমা হৈমবতীকে ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপিণী বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞান-বল-ক্রিয়া ত্রিবিধ শক্তির অখণ্ড স্বরূপতাই মহাশক্তি ইহা স্থির হইল।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের বিখ্যাত মন্ত্র—

একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি
অগ্নি যমো মাতারিশ্বানমাহুঃ। ১০।১৬৪।৪৬

"সদ্বস্তু" একটিই। বিপ্রগণ সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ঋগ্বেদের সূর্য্য, অগ্নি, সোম, পুরাণের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই সকল পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট দেবগণের নাম নহেন। ইঁহারা একই পরম সত্য বস্তুর বিভিন্ন অভিধান মাত্র। পরমবস্তুর জ্ঞান-শক্তির নাম সূর্য্য। তাঁহার ইচ্ছা-শক্তির নাম অগ্নি। তাঁহার অনুভূতি-শক্তির নাম সোম। একই পরাৎপর বস্তুর সৃজনী-শক্তির নাম ব্রহ্মা, পালনী-শক্তির নাম বিষ্ণু, অমঙ্গল নাশক পরম মঙ্গলশক্তির নাম শিব। এই বৈদিক মন্ত্রের মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে দেবী মাহাত্ম্যের মহাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি খানিতে। মায়ের বদনখানি শম্ভু, বাহুসমূহ বিষ্ণু, চরণযুগল ব্রহ্মা।

মহাদেবীর পাদপদ্ম, করপদ্ম ও বদনপদ্মের দিকে দৃষ্টি করিলেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে দেখিতে পাইবেন। মায়ের চক্ষু তিনটি। অগ্নি, কেশপাল, যম। কর্ণই বায়ু (মাতরিশ্বা), তাঁহার প্রতি রোমকূপের উজ্জ্বল রশ্মিই সূর্যদেবতা। সুতরাং মায়ের প্রতিকৃতির মধ্যে বেদের "একং সদ্‌বিপ্রাঃ—" মন্ত্র উজ্জ্বলভাবে প্রকটীভূত।

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহু, কিন্তু অঙ্গী অর্থাৎ দেহী এক-জনই। সেইরূপ নিখিল দেবদেবীসকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ। অঙ্গী ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি দুর্গা। তাঁহার দর্শনে একত্বে বহুত্ব ও বহুত্বে একত্বের অনুভূতি হয়। স্তুতিকালে দেবগণ কহিয়াছেন।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা। (চণ্ডী ৪।৩)

যে দেবী স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎকে উৎপাদন করিয়াছেন—সমস্ত দেবগণের তেজোরাশিই যাঁহার মূর্তি—আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

ছান্দোগ্য শ্রুতির যে প্রসিদ্ধ মন্ত্রের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্রটি চণ্ডিতে এক অপুর্বভাবে মহাদেবীর শ্রীমুখ হইতে উক্ত হইয়াছে। অসুররাজ শুম্ভ যুদ্ধে আসিয়া মহাদেবীর সঙ্গীয় অনেক মাতৃকামূর্তি তাঁহাকে সহায়তা করিতেছে দেখিয়া ক্রোধযুক্ত হইয়া কঠোর ভর্ৎসনা বাক্য বলিলে মা উত্তর করিলেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ॥ (১০।৫)

এই জগতে আমি ত একাই আছি। আমা ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? ওরে দুষ্ট, এই সকল আমারই বিভূতি, এই দেখ, আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। এই কথা মায়ের মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী প্রমুখ সকল মাতৃকা-শক্তি মহাদেবীর অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। অম্বিকা তখন একাই রহিলেন।

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ (১০।৭)

তারপর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সেই সমস্ত দেবীরা মহাদেবীর শরীরে মিশিয়া গেলেন। দুর্গা তখন একাই বিরাজমানা থাকিলেন।

যুদ্ধের মধ্যে ঐ নিরুপম দৃশ্যটিতে বেদান্তের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মন্ত্র মূর্তিলাভ করিয়াছে। সহস্র টীকা ভাষ্যে যাহা হইবার নহে একটি অপূর্ব লীলার মধ্যে তাহা সুব্যক্ত হইল। "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" শ্রুতির মন্ত্রটি ঋষিমুখে উক্ত। চণ্ডীর উক্তিটি মায়ের নিজমুখে কথিত। উত্তম পুরুষের একবচনের উক্তি বেশী জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হয়। এই হেতু শ্রুতির মন্ত্র অপেক্ষাও চণ্ডীর উক্তিটি অধিকতর হৃদয়স্পর্শী। বহুত্বের মধ্যে বিভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তিকে শ্রুতির মন্ত্র বিশাল প্রস্তরখণ্ডের মত চাপ দিয়া, আর চণ্ডীর মন্ত্র তীক্ষ্ণ তীরের মত বিদ্ধ করিয়া একই মহাসত্যকে দেখাইয়া দেয়। বেদান্ত দর্শনের একটি প্রধান সূত্র "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রটীতে ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ বলা আছে। যাহা হইতে জগতের প্রকাশ, যাহাতে জগতের স্থিতি, যাহাতে জগতের পরিণতি লাভ, তিনিই

ব্রহ্ম। এই তত্ত্বটি চণ্ডীগ্রন্থে বহু স্থানে কথিত হইয়াছে। স্তবে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে। (১।৭৫-৭৬)

হে দেবি, তুমি-ই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিতেছ। তুমি সর্বদা ইহাকে সৃষ্টি করিতেছ, তুমিই ইহাকে পালন করিতেছ, অন্তকালে তুমি ইহাকে সংহার করিয়া থাক। হে জগন্ময়ি, বিবিধ বস্তুর সৃজন-কালে তুমিই সৃষ্টি-শক্তি, পালন-কালে তুমিই স্থিতি-শক্তি, অন্ত-কালে তুমিই সংহারিণী-শক্তি।

চণ্ডীর মহাকালিকা, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। মহাকালিকা হইতে উদ্ভব, মহালক্ষ্মীতে স্থিতি, মহাসরস্বতীতে চরমতা প্রাপ্তি একথা পূর্বে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদান্ত মতে সকল অসম্ভবতার সমাধান ব্রহ্মসত্তায়। সকল বিরোধিতার সমন্বয় বিরাট বস্তু ব্রহ্মস্বরূপে। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অপরিণামী, বিশ্বগ হইয়াও বিশ্বাতিগ। বেদান্ত দর্শনে সূত্র আছে—

তত্তু সমন্বয়াৎ

অচিন্ত্য শক্তি আছে ব্রহ্মবস্তুতে। তাহার সামর্থ্যেই এই সমন্বয় সম্ভব হয়।

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম্
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।

দেবীমাহাত্মে মহাদেবীরও এই অচিন্ত্য-শক্তির কথা বলা হইয়াছে।

"কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ।" (৪।৬)
"রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।" (৪।২১)

অবিচিন্ত্য শক্তি মহাদেবীতেও বহু বিরোধিতার সমন্বয় রহিয়াছে। ব্রহ্মা স্তবে বলিয়াছেন—

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥ ১।৭৭

যিনি মহাবিদ্যা, তিনিই আবার মহামোহা। যিনি মহাদেবী তিনিই আবার মহাসুরী। এই অদ্ভুত বিরোধিতার সমন্বয় মহাদেবীতে।

দেবতাগণ স্তবে বলিয়াছেন—

সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যা নি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥ ৪।২৬

জগতে তোমার যে সকল সুন্দর রূপ ও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মূর্তি তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। অতি সৌমমূর্ক্তিও তাঁহার, অতীব ঘোর ভয়ঙ্করী মূর্তিও তাঁহার। এই অপূর্ব বিরোধিতা মহাদেবীতে সমন্বয়িত। পরবর্তী স্তবে দেবতারা কহিয়াছেন—

অতি সৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ ৫।১৩

তুমি অতি স্নেহময়ী অতি ভয়ঙ্করী তোমাকে নমস্কার। মহিষাসুর বধের পর দেবগণ স্তবে বলিয়াছেন—

বীর্য্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেবপরাক্রমাণাং
বৈরেষ্বপি প্রকটিতৈব দয়া ত্বয়েত্থম্।
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য,
রূপঞ্চ শত্রুভয়কার্য্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা,
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েঽপি। ৪।২১-২২

হে মাতঃ, তোমার বীর্য অসুরদিগের বিনাশকারী। তোমার দয়া শত্রুদের প্রতিও প্রকাশিত। তোমার এই পরাক্রমের তুলনা কার সহিত হইতে পারে। মনোহারী ও ভয়কারী এমন রূপই বা আর কোথায় আছে। হৃদয়ে দয়া এবং যুদ্ধে নিষ্ঠুরতা কেবল তোমাতেই দেখা গেল।

এইরূপ মনোহারিত্ব ও ভয়ঙ্করত্ব, এইরূপ কৃপাময়তা ও নিষ্ঠুরতা, এই বিপরীত ধর্মের একত্র সমন্বয় একমাত্র ব্রহ্মবস্তুতেই সম্ভব। মহাদেবী ব্রহ্মময়ী বলিয়াই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব ও চণ্ডীপ্রতিপাদ্য মহাশক্তি-তত্ত্ব অভিন্নই।

বেদ ও বেদান্তের সঙ্গে চণ্ডীর সম্বন্ধের কথা কিঞ্চিৎ বলা হইল। এখন গীতার সঙ্গে চণ্ডীর কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতেছে। বেদবেদান্ত অনেকেই আলোচনা করেন না। কিন্তু গীতা ও চণ্ডী অনেক হিন্দুর গৃহেই বিরাজিত আছেন। অনেকে নিত্য গ্রন্থদ্বয় পূজা করেন ও পাঠ করেন। এইজন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে।

চণ্ডী ও গীতা কোন খানাই একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে।

চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত তেরটি অধ্যায়। গীতা মহাভারতান্তর্গত ভীষ্মপর্বের আঠারটি অধ্যায়। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থই বেদব্যাসের রচনা।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় তান্ত্রিক ও বৈদিক দুইটি প্রবাহের কথা এই গ্রন্থের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি। বেদ-গাভীর দুগ্ধ যদি গীতা হয়, তাহা হইলে তন্ত্র-গাভীর দুগ্ধ চণ্ডী, একথা নিশ্চয় বলা চলে। দুইটি ধারার সম্যক জ্ঞান ও তাঁহাদের মিলনামিলনের রহস্য অবগত না হইলে ভারতীয় সংস্কৃতির সমগ্ররূপ দর্শন করা সম্ভব নহে। অতএব এই সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক রূপের উপলব্ধি লাভ করিতে চণ্ডী ও গীতা দুইটি গ্রন্থই অপরিহার্য।

চণ্ডীগ্রন্থে সাতশত মন্ত্র আছে। গীতাগ্রন্থেও সাতশত শ্লোক আছে। চণ্ডীর মন্ত্র গণনায় "দেব্যুবাচ" "ঋষিরুবাচ" প্রভৃতি বাক্যকেও ধরা হইয়াছে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—এইরূপ বাক্যকে তিনটি মন্ত্র ধরা হইয়াছে। গীতায় ভগবানুবাচ, অর্জুন উবাচ, প্রভৃতি কথা গণনায় ধরা হয় নাই। চণ্ডীতে মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৭৮টি মাত্র।

চণ্ডী ও গীতা উভয় গ্রন্থেই ষট্‌সংবাদ দৃষ্ট হয়। গীতা, অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। সেই কথাই সঞ্জয় বলিয়াছেন ধৃতরাষ্ট্রকে। উহাই আবার বৈশম্পায়ন বলিতেছেন জনমেজয়কে। চণ্ডীতেও সেইরূপ মেধস্ ঋষি দেবীমাহাত্ম্য বলিতেছেন সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্যকে। সেই কথাই মার্কণ্ডের ঋষি বলিতেছেন ভাগুরী মুনিকে। উহাই আবার

পক্ষীরূপী দ্রোণ মুনির চারিপুত্র কীর্তন করিতেছেন জৈমিনি মুনির নিকটে। ইহা চণ্ডীর ষট্‌সংবাদ। গ্রন্থে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছে ঐ ছয় ব্যক্তি তাহার প্রধান দ্রষ্টা বা সাক্ষী। দ্রষ্টার দর্শনেই সত্যের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা।

চণ্ডী ও গীতা উভয়ই গুরুশিষ্য সংবাদ। মোহগ্রস্ত রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য আচার্য মেধসের শরণাগত হইয়াছেন। শিষ্যদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে দেবীমাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন মুনিবর। গীতার আচার্য অর্জুনের রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণ। বিষাদগ্রস্ত অর্জুন শরণাগত হইলে—'শিষ্যস্তেঽহং' বলিয়া উপদেশপ্রার্থী হইলে শ্রীকৃষ্ণ গুরুপদে আসীন (কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুং) হইয়া উপদেশ দানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

উভয় গ্রন্থের শ্রোতৃগণ যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসু হইয়াছেন—তাহা আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক সমস্যা নয়। উভয় ক্ষেত্রেই পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্যায় তাঁহারা বিচলিত ও কর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু উহার সমাধানার্থ আচার্যেরা যে উপদেশ করিয়াছেন উহা সর্বতোভাবেই পারমার্থিক। সমস্যার সমাধানে চণ্ডীর আচার্য দেবী মহামায়ার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, আর গীতার আচার্য আত্মতত্ত্ব ও পুরুষোত্তমতত্ত্ব কহিয়াছেন। ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানে পারমার্থিক প্রসঙ্গ কেন? ইহার উত্তর এই যে—সমস্যা যাহাই হউক না কেন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও তদনুকূল জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য নির্দেশ নিখুঁতভাবে না হইলে কোন বিষয়েরই শেষ সমাধান হইতে পারে না। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধান মিলিবে আধ্যাত্মিক

জীবনদর্শনে। ইহা সনাতন ধর্ম ও আর্য ঋষির এক অনবদ্য দৃষ্টিভঙ্গি।

চণ্ডীর মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে যুদ্ধ। গীতার আবির্ভাবও যুদ্ধের প্রাক্কালে। চণ্ডীর যুদ্ধ মূলতঃ সাধকের অন্তরের। গীতার যুদ্ধ বাস্তবের, বাহিরের। চণ্ডীর যুদ্ধ সূক্ষ্মস্তরের, দেবতায় ও অসুরে। এই দেবাসুরের তাত্ত্বিক রূপ গীতাতে ভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

যাহারা আমার ভক্ত আমাতে চিত্ত অর্পণ করিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, আমি তাহাদের অজ্ঞানতম বিনাশ করি আত্মভাবস্থ উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা। সকলেরই অন্তরে অজ্ঞান-তম আছে—উহাই অসুর। জীবনের স্বচ্ছন্দ বিকাশের পক্ষে উহাই ছন্দোহীনতা বা সুর-বিরোধী অসুরভাব। আর আত্মভাবস্থ জ্ঞানদীপই মহাবিদ্যারূপিণী মহাদেবী। সকল আসুরিক শক্তির ইনি বিনাশকারিণী। অজ্ঞানতমরূপ আসুরিকতা বিধ্বংস করিতে মহাশক্তি দুর্গা প্রকটিতা। চণ্ডীর মহাদেবী নিখিল ভাস্বর জ্ঞানদীপের সমষ্টীভূতা মূর্তি। সুতরাং গীতার "নাশয়াম্যাত্মভাবস্থ জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা" মন্ত্রের মধ্যে চণ্ডীর অসুরধ্বংশকারী মহা-যুদ্ধের রহস্যটি সূত্রাকারে বিরাজিত।

চণ্ডীর যুদ্ধ মনোময় ও বিজ্ঞানভূমিতে স্থিত। অসুরগুলি মনোময় ভূমির বস্তু, মহাদেবী বিজ্ঞানময়ভূমির প্রজ্ঞাঘন শক্তি। এই দু'য়ে লড়াই। গীতার যুদ্ধ কিন্তু মানুষে মানুষে মাটির

উপর। একই অন্নময় প্রাণময় ভূমির নীতি দুর্নীতির লড়াই। গীতার যুদ্ধ রাজনৈতিক সমর, চণ্ডীর যুদ্ধ সাধন-সমর। গীতার কথা যুদ্ধের মুখে, চণ্ডীর কথা যুদ্ধের মধ্যে। চণ্ডীর প্রথম চরিতের প্রথমাংশ ভূমিকা বা ঘটনার ক্ষেত্র প্রস্তুতি। গীতার প্রথম অধ্যায়ও তাহাই। চণ্ডীতে সুরথ রাজা বটেন কিন্তু এক্ষণে রাজ্যভ্রষ্ট। রাজ্যচ্যুত রাজা বনে আসিয়াছেন কিন্তু বানপ্রস্থী হন নাই। বনে আশ্রয় লইয়াও বিষণ্ণচিত্ত। আত্মীয় স্বজন রাজপ্রাসাদ অশ্বগজ পাত্রামাত্য সকলের অমঙ্গল আশঙ্কায় চিন্তাকুল।

আর সমাধি বৈশ্য। সেও বনে আসিয়াছে ধনলোভী নিজ স্ত্রীপুত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া। রাজা ও বৈশ্যের বনেই দেখা। উভয়ের একই অবস্থা। আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি মমতাকৃষ্ট। তাহাদের জন্য অতীব দুঃখার্ত (দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ)।

গীতায় অর্জুনের চিত্তও অনেকাংশে অনুরূপ ভাবে বিষাদ-যুক্ত। পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের দ্বারা অকথ্য লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। তাহাদের সহিত যুদ্ধ হইবে ইহা বহু পূর্বেই স্থির হইয়াছে। অর্জুন তপস্যা করিয়া মহাশক্তিশালী অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। অর্জুন বীরপুঙ্গব। যুদ্ধ তাঁর কাছে ক্রীড়ার মত। কিন্তু আজ রণাঙ্গনে সৈন্যদর্শন করিতে করিতে এ কি হইল! অপ্রত্যাশিত "অকীর্তিকর" হৃদয়দৌর্বল্য ও মহামোহ উপস্থিত হইল। যাহাদের অশেষ হীনতার কথা অন্তরে গাথা আছে সেই আত্মীয় পরিজনের প্রতি মমতাকৃষ্ট

হইলেন, যুদ্ধভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই। এমন মোহ যে, তাহাদের বধ করা অপেক্ষা নিজমৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন। "যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু"—(চণ্ডী ১৷৩৩)

চণ্ডীতে মেধস ঋষির পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া রাজা সুরথ এই মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দৃষ্টদোষেঽপিবিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ" (১৷৪৪)

অর্থাৎ বিষয়ের দোষ স্পষ্টতঃ দেখা সত্ত্বেও আমরা তাহার প্রতি মমত্ব হেতু আকৃষ্ট হইতেছি কেন? গীতার মধ্যেও অর্জুনের অনুরূপ প্রশ্ন দৃষ্ট হয়।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ (৩৷৩৬)

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কে আমাদের চিত্তকে বলপূর্বক পাপে নিয়োজিত করে? উভয় প্রশ্নের মর্মার্থ একই। সব বুঝিয়াও ভুল করি, পাপে লিপ্ত হই কেন?

চণ্ডীর জিজ্ঞাসু রাজা ও বৈশ্য নিজেদের জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন। প্রশ্ন করিতেছেন—

"তৎ কেনৈতৎ মহাভাগ
যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি। ১৷৪৪

অর্থাৎ জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই মোহ কেন? উত্তরে ঋষি বলিয়াছেন যে, তোমাদের এই বিষয় ও ইন্দ্রিয় মিলন হেতু যে অববোধ তাহাকে যদি জ্ঞান বল তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞান পশুপক্ষীদেরও আছে।

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষীমৃগাদয়ঃ॥ (১৷৫০)

বস্তুতঃ এই ইন্দ্রিয়বিষয় মিলনজ জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। চণ্ডীর এই উত্তরের প্রতিধ্বনি গীতাতেও শ্রুত হয়। অর্জুনকে মৃদুমন্দ ভর্ৎসনার সুরে শ্রীভগবান যেন এই কথাই বলিয়াছেন।—"অর্জুন! তুমি জ্ঞানী ব্যক্তির মত কথা বলিতেছ (প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে) কিন্তু কাজ করিতেছ অজ্ঞানীর মত। কারণ, যাহা শোকের বস্তু নয় (অশোচ্য) তাহারই জন্য বৃথা শোক করিতেছ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরূপ করেন না।

চণ্ডীতে সুরথ-সমাধির মোহগ্রস্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত মনকে ঋষি প্রশান্ত করিয়াছেন চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা দেবী মহামায়ার পূজা করাইয়া। গীতায় অর্জুনের কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিষাদিত চিত্তকে স্বরূপস্থিত করাইয়াছেন শ্রীভগবান্ গীতায় উপদেশামৃত দ্বারা। সুরথ সমাধির বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে মাতৃদর্শনে—অর্জুনের মোহ কাটিয়াছে সত্য দর্শনে, বিশ্বরূপ দর্শনে!

চণ্ডী ও গীতার ভূমিকায় এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও পরিবেশের ভিন্নতা সুস্পষ্ট। চণ্ডীর উপদেশের পরিবেশ ঋষির তপোবন। উহার প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য—প্রশান্ত শ্রীসম্পন্ন, রমণীয় শান্তরসপ্রধান। চণ্ডীর আলোচ্য বিষয় দেবাসুর সংগ্রাম—রজো ও তমোময়। পক্ষান্তরে গীতায় পটভূমিকা এক মহাসমরের। যুদ্ধক্ষেত্র স্বভাবতঃই রজো ও তমোগুণময়। গীতার আলোচ্য বিষয় আত্মতত্ত্ব—গভীর শান্তরসাত্মক। চণ্ডীর প্রশান্ত ভূমিতে যুদ্ধের অশান্ত বার্তা। গীতার অশান্ত সমরাঙ্গনে প্রশান্তির বার্তা। চণ্ডীর মধ্যচরিতে দেবী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব ও গীতার

বিশ্বরূপ দর্শন তত্ত্বতঃ একই। উভয় ক্ষেত্রেই অনুভূতি বিজ্ঞানময় ভূমির—সামগ্রীক দৃষ্টি। বহুত্বে একত্ব,একত্বে বহুত্ব। সমগ্র সত্তাকে একবারে একত্রে একত্বে দর্শন। "ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নম্" একস্থ সমগ্র বিশ্ব। বিশ্বচরাচরের সকলই একদেহে স্থিত, ইহাই অপরোক্ষ দর্শন। ইহাই বিশ্বরূপদর্শনের মর্মকথা।

চণ্ডীতেও মায়ের মহীয়সী স্ত্রীমূর্তির মধ্যে নিখিল দেবগণ-শক্তি সমূহ প্রকটিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তি একই বিশ্বজননীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাঁহার বাহুই বিষ্ণু, চরণই ব্রহ্মা, শ্রীবদনই শিব। কেশে যম, নাসিকায় পবন, নয়নে অগ্নি। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন আয়ুধগুলি মায়ের শ্রীহস্তে শোভমান। মায়ের দর্শনেই নিখিল দেবতা ও দৈবশক্তির দর্শন মিলে। এক স্বরূপে বিশ্ব দেবতার দর্শন এক নিরুপম দর্শন।

গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জুনের ভীতিযুক্ত বিস্ময়। চণ্ডীতে মাতৃদর্শনে দেবগণের প্রীতিযুক্ত বিস্ময়। অর্জুন 'হৃষ্টরোমা' ভয়ে। দেবগণ "পুলকোদ্গমচারুদেহা" আনন্দে। দেবগণ জানেন, মা আমাদের সকল অমঙ্গল নাশ করিবেন—তাই উল্লসিত। অর্জুন জানেন না ইনি কে, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপঃ"

উগ্রমূর্তি আপনি কে আমাকে বলুন। উত্তরে জানিলেন—উনি কাল, লোকসংহারে প্রবৃত্ত (কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ)।

চণ্ডী ও গীতায় শ্রীভগবদ্স্বরূপের আবির্ভাবের কথা ঠিক একই রূপ। চণ্ডীতে দেবগণের স্তুতিতে প্রসন্না দেবীর সান্ত্বনা বাক্য—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্। ১১।৫৫

যখন যখনই দানবের অভ্যুদয়ে জীবগণ উৎপীড়িত হইবে তখন তখনই আবির্ভূতা হইয়া শত্রু নাশ করিয়া শান্তি আনয়ন করিব। গীতাতেও শ্রীভগবান অনুরূপ বাণী বলিয়াছেন—যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন সাধুগণের রক্ষণ দুষ্কৃতির বিনাশ ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। (সম্ভবামি যুগে যুগে)। উভয় বাণীতেই বুঝা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভগবতী দুর্গা উভয়েরই দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত উৎপীড়িত জীবগণের জন্য দরদ আছে। আমাদের দুঃখ তাঁদের প্রাণে লাগে। ডাকিলে শুনেন। প্রয়োজন বোধ করিলে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেন। পরিশ্রম করিয়া দুঃখ দূর করেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন নন্দ-গোকুলে যশোদার ঘরে। সেই যশোদার ঘরেই মা আসিয়াছেন যোগমায়া রূপে কন্যা হইয়া, একই রজনীতে একই সময়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে যশোদা যমজ প্রসব করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ ও যোগমায়া। এই জন্য কন্যা যোগমায়াকে জগতে "বিষ্ণোরনুজা" বলা হইতেছে। বাসুদেব তাঁহার পুত্রকে যশোদার শয্যায় রাখিলে দুই স্বরূপ একত্ব প্রাপ্ত হন। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন "সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—নিজ মায়াশক্তির সঙ্গে সম্ভূত হয়। আর সেই আত্মমায়া-স্বরূপিণী দেবীই চণ্ডীতে বলিয়াছেন—আমি নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে আসিব (নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা ১১।৪২)—এই একবাক্যতা চমৎকার।

গীতায় শ্রীভগবান্ নিজের স্বরূপ বলিয়াছেন "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ" (১০।২০)। চণ্ডীতে ঋষি মহাদেবীর তত্ত্ব বলিয়াছেন—

"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে" ৫।১৭

আত্মার স্বরূপ হইল চেতনা বা চৈতন্যস্বরূপতা। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি আছি সর্বভূতে আত্মা-রূপে। ঋষি বলিলেন, মহাদেবী আছেন সর্বত্র চেতনারূপে। ভিন্নতা কিছুই নাই।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—এই বিশ্বজগৎ আমার একাংশে অবস্থিত।

"একাংশেন স্থিতো জগৎ" ১০।৪২

চণ্ডীতে দেবতাগণ মায়ের স্তবে বলিয়াছেন—

"সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতং" ৪।৭

তুমি সকলের আশ্রয়। এই সমস্ত জগৎ তোমায় অংশভূত। উভয়ে একই কথা।

গীতা বলিয়াছেন প্রকৃতি ও পুরুষ দুই তত্ত্বের মিলনে সংসার সৃষ্টি। গীতা সমস্ত বিকার ও গুণকে প্রকৃতিসম্ভব বলিয়াছেন—

'বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্' ১৩।১৯

এবং দেহস্থ পুরুষকে বলিয়াছেন, ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ (১৩।২২) দেবীমাহাত্ম্যে মহাদেবী আদ্যা পরমাপ্রকৃতি (পরমা প্রকৃতি-মাদ্যা ৪।৭)। কিন্তু এই পরমাপ্রকৃতির মধ্যে পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয় সম্মিলিতা, কারণ মহাদেবী কেবল নিখিল বিকার ও গুণের মূল নহেন—তিনি চৈতন্যময়ী এবং মহেশ্বরীও বটেন। মহাদেবী

প্রকৃতি বলিয়া ত্রিগুণময়ী, আবার পুরুষ বলিয়া ত্রিগুণের দোষের দ্বারা লিপ্ত নহেন। এইরূপ আশ্চর্যজনক তত্ত্ব বলিয়া মহাদেবী হরিহরাদিরও অজ্ঞেয়া।

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈঃ
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। (৪।৭)

তুমি সমস্তজগতের কারণ। তুমি ত্রিগুণা হইয়াও দোষে লিপ্ত নহ। হরিহর প্রভৃতিরও তুমি অজ্ঞেয়া। অপারা শব্দের অর্থ টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী লিখিয়াছেন অনধিগতস্বরূপা। শ্লোকের "অপি" শব্দের অর্থ উক্ত টীকাকার লিখিয়াছেন—

"অপীত্যাশ্চর্যে, ত্রিগুণাপি দোষৈর্নজ্ঞায়সে
রাগাদিভির্ন বিষয়ীক্রিয়সে আশ্চর্য্যমেতৎ।"

ত্রিগুণাদয় প্রকৃতির স্বরূপ; গুণাতীত্ব পুরুষের স্বরূপ।—এই দুইয়ের একত্র মিলনটিই আশ্চর্য বস্তু।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—যেখানে যাহা কিছু শ্রীমৎ ও উর্জ্জিত ও বিভূতিযুক্ত, সকলই আমার অংশভূত বলিয়া জানিবে।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ (১০।৪১)

চণ্ডীতে ভগবতী অসুরকে বলিলেন, রে দুষ্ট দেখ আমার বিভূতি সকল আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। এই বলিয়া আকর্ষণ করিলেন। অসুর দেখিল অগণিত মাতৃকামূর্তি দেবীর দেহে প্রবেশ করিতেছে, প্রবেশ করিয়া এক হইয়া যাইতেছে। মা বলিলেন—আমি ঐশ্বর্য দ্বারা এই যুদ্ধে বহুরূপে যে অবস্থান

করিতেছিলাম, তাহা আমি উপসংহার করিলাম। আমি এখন একাই আছি একাই যুদ্ধ করিব, তুই স্থির হ।

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যোজৌ স্থিরো ভব।" ১০।৮

নিখিল বিভূতি যে এক বস্তুরই বহু প্রকাশ—গীতায় ইহা সুব্যক্ত, চণ্ডীতে বাস্তবায়িত।

বৈশেষিক দর্শনের ঋষি কণাদ ধর্মের লক্ষণ বলিয়াছেন "যতো নিঃশ্রেয়সোঽভ্যুদয়ঃ স ধর্মঃ।" যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্, তাহাই ধর্ম। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মের ফল অভ্যুদয়। নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মের ফল নিঃশ্রেয়স্; পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ধর্মের দিকে চণ্ডীর লক্ষ্য নিবদ্ধ।

সুরথ ও সমাধির অর্চ্চনায় মা পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, বর যাচ্ঞা কর। রাজা চাহিলেন অবিভ্রংশ রাজ্য। সমাধি চাহিলেন তত্ত্বজ্ঞান। যে জ্ঞানের উদয় হইলে মিথ্যা আমি ও আমার নাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই চাহিলেন সমাধি। রাজা চাহিলেন, অভ্যুদয় বৈশ্য চাহিলেন নিঃশ্রেয়স্। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

যে ব্যক্তি আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে তেমন ভাবেই ভজনা করি। শ্রীচণ্ডীতে তাহা প্রকট করিয়া দেখান হইল। সুরথ রাজা ভজনা কারয়াছেন রাজ্যসুখের জন্য, সমাধি বৈশ্য ভজনা করিয়াছেন মুক্তিসুখের জন্য। ভগবতী উভয়কেই বাঞ্ছানুরূপ ফলদান করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেন চণ্ডীতে শুধু প্রবৃত্তি-ধর্ম—ভোগের কথা। গীতায় শুধু নিবৃত্তি-ধর্ম, ত্যাগের কথা—যোগের কথা। এই কথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। চণ্ডীতে যেমন ভোগের কথা আছে, মোক্ষ অপবর্গের কথাও যথেষ্ট আছে, আর গীতায় যে মোটেই ভোগের কথা নাই, এমন কিছু নহে।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

যুদ্ধে মৃত্যু হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। এই কথা সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি মার্গের ভোগের কথাই। "উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়"—এই ধুয়া ভগবান্ গীতার আগাগোড়াই বজায় রাখিয়াছেন। বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াও বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্" (১১।৩৩)

অতএব অর্জুন, তুমি যুদ্ধার্থ উত্থিত হও। শত্রু জয় করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। ইহা ভোগমার্গেরই নির্দেশ। "যুধ্যস্ব জেতাসি" যুদ্ধ কর জয় হবে, এইকথা ত্যাগ-মার্গের নহে। তবে গীতা ও চণ্ডীতে পার্থক্য এই,—চণ্ডীতে ভোগ যোগ দুইটি পৃথক বস্তু। ভোগের জন্য ভোগ, ত্যাগের জন্য যোগ। ভোগ চাও এক পথ, ত্যাগ চাও আলাদা পথ। আর গীতায় ভোগ যোগ পৃথক নহে। গীতা ভোগের কথা বলিয়াছেন বটে কিন্তু ত্যাগের ভূমিকায়। সর্বতোভাবে ত্যাগের ভূমিতে দাঁড়াইয়া ভোগ কর। গীতার দৃষ্টি নিবৃত্তির দিকে—মূল কথা তার ত্যাগ, কিন্তু নিবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির, ত্যাগের সঙ্গে ভোগের কোন বিরোধিতা দেখিতে

পায় না। গীতায় .ভোগ ত্যাগের কুক্ষিগত। ভোগ কর ভোগস্পৃহা-শূন্য হইয়া, কর্ম কর কর্মফল ত্যাগ করিয়া, যুদ্ধ কর আমাকে স্মরণ করিয়া। "মামনুস্মর যুধ্য চ" (৮।৭) কর্ম্ম কর কর্তৃত্বাভিমান ছাড়িয়া—শত্রু জয় কর নিমিত্ত মাত্র হইয়া। শত্রুর সঙ্গে লড়াই কর শত্রুতাভাব না রাখিয়া 'নির্বৈর' হইয়া। গীতায় প্রেরণা আছে কর্ম করাইতে—কিন্তু সেই করা ক্রিয়ার কর্ত্তা আছে কর্তৃত্বাভিমান নাই—কর্ম আছে কর্মফলাকাঙ্ক্ষা নাই। এই কর্তৃকর্মহীন স্তব্ধ ক্রিয়ার মধ্যে জ্ঞান-কর্মের সমন্বয়, ভোগ-যোগের সমন্বয়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির একাত্মতা। ভোগের প্রতীক ধনুর্ধর পার্থ। ত্যাগের প্রতীক যোগেশ্বর কৃষ্ণ। গীতা ধনুর্ধারীর রথে যোগেশ্বরকে সারথি করিয়া এই কথাই জানাইয়াছেন—পূর্ণজ্ঞানী হইয়া কর্মের অতীত হইয়া অপর্যাপ্ত কর্ম কর। ভোগাতীত হইয়া ভোগের মধ্যে বাস কর। যোগেশ্বরকে জীবন-রথে সারথী করিয়া কর্মের ধনু ধারণ কর। সর্বশেষে সঞ্জয়ের মুখেও তাহাই শুনি—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম" (১৮।৭৮)

সুতরাং গীতা ও চণ্ডীর পার্থক্য এই যে চণ্ডী দুই হাত বাড়াইয়া এক হাতে ভোগ ও অপর হাতে যোগ দিতেছেন। আর গীতা দুই হস্তে অঞ্জলি করিয়া ভোগ-যোগের এক অপূর্ব্ব মিলনময় সন্দেশ বিতরণ করিতেছেন।

চণ্ডীপাঠে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" মন্ত্রের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি হেতু অনেকে মনে করেন—চণ্ডীতে শুধু

দেহি দেহি রব কেবল ভোগময় রাজ্যের জন্যই প্রার্থনা। এইরূপ মনে করা ঠিক নহে। প্রথমতঃ 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' মন্ত্রটি মূল চণ্ডীর নহে। উহা অর্গলা স্তোত্রের অন্তর্গত। ঐ স্তবপাঠের বিধি আছে চণ্ডীপাঠের পূর্বে। দ্বিতীয়তঃ 'রূপং দেহি জয়ং দেহি' ইত্যাদি প্রার্থনার মধ্যে দ্বিবিধ তাৎপর্যই অন্তর্নিহিত আছে। যিনি ভোগাকাঙ্ক্ষী তাঁহার কাছে এক প্রকার অর্থ, যিনি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী তাঁহার কাছে অন্য প্রকার অর্থ। যিনি ভোগী তিনি দেহের রূপ কামনা করেন—যিনি ত্যাগী তিনি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান জাগাইয়া তুলিবার প্রার্থনা করেন। ভোগী লৌকিক যুদ্ধে, মামলা মোকদ্দমায় জয় কামনা করেন ; যিনি ত্যাগী তিনি সাধন-সমরে জয়াকাঙ্ক্ষা করেন। ভোগী চাহেন লৌকিক নাম যশঃ খ্যাতি, তাই বলেন যশো দেহি। সাধক চাহেন ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জগতে কীর্তিত হইবার।

কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি।
রাধাকৃষ্ণ ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥

ভোগার্থী বাঞ্ছা করেন লৌকিক শত্রুর ধ্বংস ; তাই বলেন "দ্বিষো জহি"। ত্যাগী যোগী চাহেন সাধন-পথে যারা বাধক সেই কামাদি শত্রুর অবলুপ্তি। ভোগী যেখানে পাঠ করেন—

"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্"

সাধকগণ সেখানে চিরকাল পাঠ করেন—

"ভক্তিং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীং॥"

তাছাড়া মায়ের কাছে অবনত হইয়া যে যাহাই কামনা করুন, মা সকল সময় সকলকে তা দেন না। যে বস্তু দিলে একজনের

উপকার অন্যের ক্ষতি তাহা দেন না। যাহাতে জগতের সকলের কল্যাণ তাহাই দেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া জগজ্জননী বলিলেন—

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥ (১১।৩৭)

হে দেবগণ, আমি বরদাত্রী; তোমরা মনে মনে জগতের হিতকর যে ইচ্ছা করিতেছ তাহা প্রার্থনা কর, এখনই দিতেছি। নিষ্কাম ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় নয়। সে সর্বদা কর্ম করে "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" হইয়া। সুতরাং মা যে জগতের মঙ্গলময় বর দিবেন তাহা নিষ্কাম ভক্তেরও কাম্য। দেবতাগণও বলিয়াছেন—

ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে
লোকানাং বরদা ভব। (১১।৩৫)

হে স্তবনীয়ে দেবী! ত্রিভুবনবাসী জনগণের জন্য বরদাত্রী হও।

কেহ কেহ মনে করেন গীতা ভক্তির কথায় পূর্ণ। চণ্ডীতে ভক্তির গন্ধও নাই। এরূপ মনে করাও ঠিক নহে। গীতা শুধু ভক্তিকথায় পূর্ণ নয়—জ্ঞান কর্ম যোগ সাংখ্য সকল বস্তুর মিলনময় গীতাগ্রন্থ। চণ্ডীগ্রন্থও ভক্তিশূন্য নহে। যে অর্গলা স্তবে "রূপং দেহি জয়ং দেহি" প্রার্থনা পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে সেই স্তবেই আছে—

"দেবি ভক্তজনোদ্দাম দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে (২৪)

হে দেবি অম্বিকে, তুমি ভক্তদিগকে অনর্গল আনন্দোদয় দান করিয়া থাক। ভক্তদিগকে যে কত আনন্দ দান করেন তাহার প্রমাণ চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণের স্তুতিকালে। স্তবপরায়ণ

দেবগণের বর্ণনায় ঋষি বলিয়াছেন—"প্রণতি-নম্রশিরোধরাংসা" "প্রহর্ষপুলকোদ্গম-চারুদেহাঃ" তাঁহারা গ্রীবা ও স্কন্ধ নত করিয়া প্রণাম করিয়া আনন্দে রোমাঞ্চ উদ্গত হওয়ায় সুন্দর দেহশালী হইয়া মহাদেবীকে স্তব করিয়াছিলেন। আনন্দ গভীর না হইলে পুলক হয় না।

চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের স্তবের শেষে বলিয়াছেন—

যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ।
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ॥ (৫।৮২)

আমরা ভক্তিনম্র হইয়া স্মরণ করিলে জগন্মাতা তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ নষ্ট করিয়া থাকেন। সর্বশেষ চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের স্তবে দেবগণ কহিয়াছেন—হে দেবি, মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

"পাপেভ্যোহনঃ সুতানিব" (১১।২৭)

এই প্রার্থনার মধ্যে প্রীতিপূর্ণ আর্তি বিদ্যমান। পরেই বলিয়াছেন, তোমার যাঁহারা আশ্রিত তাঁহাদের আর বিপদ নাই।

ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং (১১।২৯)

আশ্রিত, শরণাগত, মুখের কথায় হয় না—হৃদয়ে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে। তারপর একটি আশ্চর্য খবর বলিয়াছেন—

ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি (১১।২৯)

তোমাকে যাঁহারা আশ্রয় করে তাঁহারা সকলের আশ্রয় হইয়া থাকে। সকলের বলিতে, নিখিল বিশ্বের সকলের ; আর এক মন্ত্রে তাহা স্পষ্টতর করিয়াছেন—

"বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ" (১১।৩৩)

যাঁহারা তোমার কাছে ভক্তিভরে বিনম্র তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয় হইয়া থাকে। কতখানি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মাতৃচরণ আশ্রয় করিলে সে নিখিল বিশ্বের আশ্রয়স্থল হইতে পারে তাহা বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়। বৈষ্ণবাচার্যেরা হরিভক্ত সম্বন্ধে বলেন—

ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।

চণ্ডীর পঞ্চমধ্যায়ের স্তবটিকে পুনঃ পুনঃ

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শত শতবার নমস্কার। গীতার ভগবান্ অর্জুনকে বলিয়াছেন

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। ৯।৩৪

মন্মনা মদ্ভক্ত হইয়াই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতে বলিয়াছেন।

ভারতীয় শাস্ত্রে শ্রীভগবানের গুণাবলির মধ্যে 'হতারিগতি-দায়কত্ব' একটি প্রধান গুণ। যে শত্রুকে তিনি নাশ করেন তাহারও সদ্‌গতি দান করেন। পূতনা মোক্ষন-লীলায় শাস্ত্রকার বলিয়াছেন পূতনার কথা—

জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্

জিঘাংসাবৃত্তি লইয়া আসিয়াও পূতনা সদ্‌গতি পাইল। চণ্ডী-গ্রন্থে মহিষাসুরের যুদ্ধের প্রসঙ্গে, স্তবে দেবগণ কহিয়াছেন, মহিষাসুর বধকালে তোমার বাহিরে নিষ্ঠুরতা থাকিলেও "চিত্তে-কৃপা" ছিল। তোমার ভয়ঙ্কর শস্ত্রপ্রভাসমূহের চকমকানিতে অসুরদের দৃষ্টি যে নষ্ট হয় নাই তাহার কারণ তোমার অর্দ্ধ-চন্দ্রযুক্তা স্নিগ্ধ বদনখানি তাহারা দেখিতেছিল বলিয়া। (৪।২০) তোমার শস্ত্রদ্বারা পবিত্র হইয়া তাহারা উৎকৃষ্ট লোকে গমন করুক

এইরূপ মতি লইয়াই তুমি তাহাদিগকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছ। নতুবা ত শুধু দৃষ্টি দ্বারাই তাহাদিগকে ভস্মীভূত করিতে পারিতে।

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী। (৪।১৯)

করুণাময়ী মহাদেবীও যে হতারিগতিদায়িকা ইহা এই মন্ত্রে সুব্যক্ত হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে উভয় গ্রন্থের ফলশ্রুতিও অনুরূপ। গীতার শেষে বক্তা বলিতেছেন—

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ।। (১৮।৭০)

যিনি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন তিনি জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবেন। আরও বলিয়াছেন—

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ১৮।৭১

যিনি শ্রদ্ধাবান ও অসূয়াশূন্য হইয়া গীতা শ্রবণ করেন তিনি পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যবানগণের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন।

দেবীমাহাত্ম্যেও মহাদেবী বলিয়াছেন—

শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্
ন তেষাং দুস্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ (১২।৪)

যে আমার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য ভক্তিসহকারে পাঠ করিবে তাহার কোন পাপ, পাপজনিত বিপদ হইবে না। আরও বলিয়াছেন—

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥ (১২।৭)

সেই জন্য, আমার এই মাহাত্ম্য একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সকলের পাঠ ও শ্রবণ করা উচিত। তাহাই এক উৎকৃষ্ট স্বস্ত্যয়ন। আরও অনেক ফলের কথা আছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা—

সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।

আমার মাহাত্ম্য আমার সন্নিধিকারক। পুরাণে শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

গীতা শ্রবণে অর্জুনের মোহ নষ্ট হইল—স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, চিত্ত স্থির হইল, সকল সংশয় কাটিয়া গেল। গীতা শ্রবণ করিতে করিতে "সুদুদর্শ বিশ্বরূপ" দর্শন হইল।

দেবী মাহাত্ম্যে ঋষিবর চণ্ডীগ্রন্থ শুনাইয়া শ্রোতা সুরথরাজা ও সমাধি বৈশ্যকে দেবীর চরণে শরণাগতি গ্রহণ করিতে বলিলেন।

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥ (১৩।৫)

সেই পরমেশ্বরীর শরণাগত হও। তাঁহাকে আরাধনা করিলে তিনি মনুষ্যদিগকে ভোগ স্বর্গ ও অপবর্গ দান করিয়া থাকেন।

ঋষি তাঁহাদিগকে আরাধনায় নিযুক্তা করিয়াছিলেন। আরাধনার ফলে তাঁহারা মায়ের সাক্ষাৎকার ও বাঞ্ছানুরূপ ফল লাভ করিলেন।

ঋষি বলিলেন, পরমেশ্বরী ভোগ স্বর্গ ও অপবর্গ দান করেন। এখানে স্বর্গ শব্দের অর্থ যদি ইন্দ্রাদিলোক ধরি তাহা হইলে তজ্জন্য দেবীর আরাধনা ও শরণ গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। কেননা স্বর্গাদি পুণ্য ফলেই লাভ হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে" আবার ভ্রষ্ট হইতে হয়। এই জন্য স্বর্গ শব্দকে মোক্ষার্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্বর্গ অর্থ মোক্ষ হইলে অপবর্গ অর্থ কি হইবে ইহাই আলোচনীয়।

অপবর্গ শব্দ মোক্ষ অর্থেই গৃহীত হয়। কিন্তু কখনও কখনও ভক্তি শাস্ত্রে ভক্তি অর্থেও অপবর্গ শব্দের গ্রহণ দেখা যায়। মহাদেবী ভক্তি-দাত্রী একথা আছ্যাস্তবে উক্ত আছে।

"সুখদা মোক্ষদা দেবী বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী"

যাহারা রজোগুণী ভক্ত মহাদেবী তাহাদের সম্বন্ধে সুখদা। যাহারা সত্ত্বগুণী ভক্ত তাহাদের সম্বন্ধে মোক্ষদা। যাহারা গুণাতীত তাহাদিগকে জগন্মাতা ভক্তি দান করিয়া থাকেন।

ভক্তি অর্থে অপবর্গ শব্দের প্রয়োগের একটি দৃষ্টান্ত ভক্তিশাস্ত্র হইতে দেওয়া যাইতেছে। মহাপ্রভু ভ্রমণ কালে দক্ষিণ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন বিল্বমঙ্গলঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগ্রন্থ। সেই গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোকঃ—

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎ কল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্যাকুলম্
স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধনীবিবিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥২॥

বৃন্দাবনে পরমোদার কিশোরাকৃতি একটি বস্তু আছে। তাহার চারিটি বিশেষণ—(১) স্বর্গীয় তরুণীগণের হস্তাগ্র হইতে বিগলিত কল্পতরুর পুষ্পদ্বারা সমাবৃত। (২) আবদ্ধ বেণুনাদ শ্রবণে আনন্দে ব্যাকুলতাবিহীন। (৩) কটিদেশ হইতে বারংবার বিগলিত নীবিবন্ধ অবরুদ্ধ করিতে করিতে অতীব শোভাযুক্ত গোপীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত। (৪) হস্তন্যস্তনতাপবর্গং—এই বিশেষণের অর্থ করিতেছেন সারাঙ্গরঙ্গদা টীকাকার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—হস্তেনন্যস্তনতানাং স্বভজনোন্মুখান অপবর্গ স্বপার্যদ রূপানন্দ-দেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গং যেন যদ্বা অপবর্গ' প্রেমভক্তি যোগো যেন।

সুতরাং বিশেষণটির অর্থ হইল যাহারা শ্রীচরণে নত হইয়া ভজনোন্মুখ হইয়াছে তাহাদিগকে যিনি নিজ পার্যদ দেহ অথবা প্রেমভক্তি দান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের গদ্যে একস্থলে প্রেমভক্তি অর্থে অপবর্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—টীকায় কবিরাজ গোস্বামী তাহা নিজ বাক্যের সমর্থনে উল্লেখ করেন।

অতএব চণ্ডীর অপবর্গ শব্দ ভক্তি অর্থে গ্রহণ করিয়া অর্থ করা চলে যে মহাদেবী পদাশ্রিত যোগ্য জনে ভক্তিধনও দান করিয়া থাকেন। পৌর্ণমাসী কাত্যায়নীরূপে যে তাহা করেন ভক্তসমাজে তাহা প্রসিদ্ধও আছে।

শ্রুতি সূত্র ও গীতার সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর সম্বন্ধ সংক্ষেপে আলোচিত হইল। দেখা গেল মূলতঃ একই মহাসত্য সর্ব্বত্র ঘোষিত। তন্ত্রের দৃষ্টিকোণ হইতে বৈদিক সত্যের দর্শনই চণ্ডী এইরূপ বলা চলে।

শক্তিবাদ ও মহাপ্রভু

শক্তিবাদ হইল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের ভিত্তি। "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।" ইহা হইল শক্তিবাদের মূলমন্ত্র। শক্তি হইতেই জগৎ জাত, শক্তিতেই জগৎ স্থিত, শক্তিতেই জগৎ বিলয়-প্রাপ্ত। তন্ত্রশাস্ত্রমতে শক্তিই পরব্রহ্ম। পুরুষতত্ত্ব শিব আছেন, শবতুল্য।

বেদশাস্ত্রের ভিত্তি হইল পুরুষবাদে। "পুরুষ এবেদং সর্ব যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং।" ইহা হইল পুরুষবাদের মূল মন্ত্র। পুরুষ হইতেই জগৎ সৃষ্ট, পুরুষাশ্রয়েই জগতের স্থিতি, পুরুষেই চরম লয়তা প্রাপ্তি। বৈদিক শাস্ত্র মতে পুরুষই পরব্রহ্ম।

নিগম ও আগম, বৈদিক ও তান্ত্রিক চিন্তাধারা দুই-ই ভারতীয় ঋষির সাধনার সম্পদ। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সম্পদকে অখণ্ডভাবে গ্রহণ করিতে হইলে শক্তিবাদ ও পুরুষবাদের সুষ্ঠু সমাধান ও সামঞ্জস্য অপরিহার্য। ভারতীয় প্রধান দর্শন শাস্ত্রসমূহে এই সমাধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই পরিস্ফুট।

পুরুষ হইতেছেন শক্তিমান। প্রকৃতি শক্তিরই নামান্তর। শক্তি হইতেই শক্তিমান কিংবা শক্তিমানেরই শক্তি। শক্তিবাদী বলেন, ধন আছে বলিয়াই ধনবান। শক্তি আছে বলিয়াই শক্তিমান্। আগে ধন, পরে ধনশালী। আগে শক্তি পরে তাহা হইতে শক্তিবিশিষ্ট শক্তিমান।

পুরুষবাদী বলেন, ধন ত ধনবানেরই করায়ত্ত সম্পদ। শক্তি ত শক্তিমানের অধীন তত্ত্ব। যে অধীন, সে ত গুণীভূত। যার অধীন সেই বস্তু, সে-ই স্বাধীন। স্বাধীন, স্বরাট বস্তুই প্রধান। অতএব শক্তিমান বা পুরুষতত্ত্বই মৌলিক।

এখানেই সমস্যা। সকল শাস্ত্রেই এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা। আদি তত্ত্ব কে? অনাদি চরম বস্তু কোন্‌টি? শক্তিমান, না শক্তি? পুরুষ, না প্রকৃতি? ভগবান, না ভগবতী? কৃষ্ণ না কালী?

তন্ত্রবাদ শক্তিকে প্রধান স্থান দিয়াছেন; তদ্বিপরীত অদ্বৈতবেদান্ত শক্তির কোন স্থানই রাখেন নাই। অদ্বৈত-বেদান্তীমতে পরব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, সুতরাং নিঃশক্তিক। শক্তির কার্য্য হইল ক্রিয়া। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়। ব্রহ্ম শক্তি-সম্পর্কবর্জ্জিত পুরুষ। বস্তুতঃ অদ্বৈত ব্রহ্ম পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। ব্রহ্ম শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। শক্তির ক্রিয়া ছাড়া ত জগৎ চলিতে পারে না। ব্রহ্ম যদি নিঃশক্তিক, তাহা হইলে জগতের কি গতি? ইহার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ কোন বস্তু নহে। ইহা মিথ্যা। মিথ্যা পদে অলীক নহে। সত্তে অসতের ভান। রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

অদ্বৈতমতে শক্তিই মায়া। মায়া সদ্বস্তু নহে। ব্রহ্মই সদ্বস্তু! মায়া সৎ হইলে দুইটি সৎ বস্তুর আশঙ্কা হয়, অদ্বৈতবাদই বিপন্ন হয়। মায়া সর্ব্বতোভাবে অসৎও নহে, কারণ অসতের ভান হয় না। সুতরাং মায়া বা শক্তি সৎ ও অসতের মধ্যবর্ত্তি কোন অনির্ব্বচনীয় স্থিতি। এই মতে শক্তি উপেক্ষিত, মিথ্যা বলিয়া

গৃহীত। অনিত্য বস্তুতেই শক্তির খেলা। নিত্য সত্য ব্রহ্মে শক্তির বিদ্যমানতা নাই।

সাংখ্যদর্শন পুরুষ প্রকৃতি উভয়কেই সমান মূল্য দেওয়ায় দ্বৈতবাদী। এই মতে পুরুষের ঈক্ষণে প্রকৃতি ক্রিয়াবতী। প্রকৃতির পরিণামই জগৎপ্রপঞ্চ। প্রকৃতির বন্ধনে পুরুষ বদ্ধ। প্রকৃতি বন্ধন খুলিলে পুরুষ মুক্ত।

এই সমাধান সুন্দর, কিন্তু সুদৃঢ় নহে। দুইটি দুর্ব্বলতায় এই মত অদৃঢ়। (১) পুরুষের বহুত্ব। (২) প্রকৃতির জড়ত্ব। সাংখ্যে পুরুষ এক নহে, বহু। অসংখ্য পুরুষ, প্রত্যেকেই কেমন করিয়া নিত্য ও চরম বস্তু, ইহা ভাবিতে বুদ্ধি বিদ্রোহী হয়।

সাংখ্যে পুরুষ চৈতন্যময়। প্রকৃতি কিন্তু অচেতনা, জড়া। জড়ের কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি অকর্ত্তা। এই দুই অকর্ত্তার মিলনে অন্ধ-খঞ্জ ন্যায়ে অদ্ভুত ভাবে জগৎ-কর্তৃত্ব—বুঝিয়া লইতে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতে চরম তত্ত্ব পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম। তিনি প্রকৃতি-সম্পর্ক-হীন নহেন। তিনি প্রকৃতি দ্বারা বিশেষিত। প্রকৃতির প্রকাশ দ্বিবিধ, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। এই দুই শক্তি হেতু তিনি শক্তিবিশিষ্ট।

শ্রীগীতাতেও পুরুষোত্তমতত্ত্বই মূল-তত্ত্ব। তাহার দুইটি প্রকৃতি। পরা ও অপরা। পরা প্রকৃতি হইতেছে জীব-চৈতন্য অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। পরা প্রকৃতি অপরা প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া আছে। আর উভয়কে ধারণ করিয়াছেন পরমেশ্বর।

গীতার মতে পুরুষের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী হন। শক্তিকে ক্রিয়াবতী করে শক্তিমান। প্রকৃতি অনাদি। তথাপি পুরুষের অধীন। বিশেষণ যেমন বিশেষ্যের উপর নির্ভরশীল, গুণ যেমন দ্রব্যের আশ্রয়ে স্থিত, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষকে অবলম্বন করিয়াই বিরাজমানা।

বিশেষণ স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং প্রকৃতি স্বাধীনা নহে। প্রকৃতি ও পুরুষ দু'য়ের স্বাধীনতা সমান না হইলে উভয়ের মিলনের আস্বাদন সুখাবহ হয় না। গীতায় ভগবানের আর একটি স্বকীয়া প্রকৃতি (স্বাং প্রকৃতিং)-র কথা উল্লেখিত আছে কিন্তু গীতা তাঁহার সহিত পুরুষের কোন বিশেষ মিলনের আস্বাদন করেন নাই। করিলে হয়ত ঐ পথে সমাধান মিলিত।

নির্দ্দোষ সমাধান দাবী করে, পুরুষ প্রকৃতির সমান স্বাধীনতা —শক্তি ও শক্তিমানের সমান অধিকার ও সামর্থ্য। কিন্তু কোন মতেই তাহা দৃষ্ট হয় না। তন্ত্রমতে শক্তিই প্রধান। শক্তিমান শিব শব হইয়া আছেন। অদ্বৈতবাদ মতে শক্তিমানই সর্ব্বস্ব। শক্তি মিথ্যাভূত। বিশিষ্টাদ্বৈত ও গীতার মধ্যে শক্তি-গুণীভূত শক্তিমানই প্রধান তত্ত্ব।

কেহই উভয়কে সমমূল্য দেন নাই। না দিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। দুই-ই সমান অধিকার, সমান সামর্থ্য ও সমান স্বাধীনতা পাইলে পরতত্ত্ব নির্দ্দেশ অসম্ভব হইয়া উঠে। চরমতত্ত্ব এক বই দুই হইলে এক অন্যকে সীমাবদ্ধ করে। শক্তি শক্তিমান দুই সর্ব্বতোভাবে সমান হইলে শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বাণী ব্যাহত হয়।

ইহা এক বিষম সমস্যা। প্রকৃতি পুরুষ দুই-ই স্বাধীন ও সম-সামর্থ্যবিশিষ্ট না হইলে রসশাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়। আবার দুইটিই স্বরাট হইলে তত্ত্ব-শাস্ত্র ক্ষুণ্ণ হয়। প্রকৃত সমাধানে রস ও তত্ত্ব উভয়কেই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

এই রসশাস্ত্র ও তত্ত্বশাস্ত্রের বিরোধের সমাধান হইতে পারে যদি শক্তি ও শক্তিমান দুই হইয়াও এক হন। এক হইয়াও দুই হন। এ কথার তাৎপর্য্য হইল এই যে, একই বস্তু দুইভাগ হইবে এবং দুই মিলিয়া তাহাদের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহাদের একের সত্তা সার্থক হইবে অপরের মাধ্যমে! যেমন আলোর সত্তা সার্থক চক্ষুর মাধ্যমে। চক্ষুর সত্তা সার্থক আলোর মাধ্যমে।

আলোচ্য সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অনুধ্যান করিয়াছেন ভাগবতীয়েরা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণ তত্ত্বেই শক্তি শক্তিমান সমস্যার সম্যক্ সমাধান।

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অভিনব। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শক্তি। কিন্তু রাধা ছাড়া কৃষ্ণ কিছুই নহেন। কৃষ্ণ রাধা-শক্তিতেই শক্তিমান্। কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া রাধা কিছুই নহেন। রসনার মাধ্যমেই শর্করার মিষ্টত্বের প্রকাশ। শর্করার মাধ্যমেই রসনার মধুর রসানুভূতি—শক্তির বিলাস। সেইরূপ শ্রীরাধার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব। শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমেই শ্রীরাধার রাধাত্ব। সুতরাং তাঁহারা দুই হইয়াও এক। তত্ত্বের অখণ্ডতার মধ্যে রসের খণ্ডতা। তাত্ত্বিক অভিন্নতার মধ্যে নায়ক নায়িকার ভিন্নতা।

লৌকিকে নারী জীবনের দুইটি দিক। এক, পতির

প্রীতিবিধান, অপর সৃষ্টি ও পালন। মূল-শক্তির সেইরূপ দ্বিবিধা বৃত্তি। হ্লাদিনী ও সৃজনী-পালিনী। যাঁহারা সৃজনী-পালিনী বৃত্তির উপর অধিক দৃষ্টি দিয়াছেন, তাঁহাদের ভাবনায় পুরুষের সঙ্গে শক্তির সম্বন্ধ সুষ্ঠুরূপে ব্যক্ত হয় নাই। ভাগবতীয়েরা পুরুষোত্তমের সুখাবগাহী হ্লাদিনী শক্তির উপর মুখ্য দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন; এই জন্যই প্রকৃত সম্বন্ধটি সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণের দৃষ্টিতে শক্তির মূল স্বরূপ বা স্বরূপা শক্তি হইলেন হ্লাদিনী। এইটি শক্তির অন্তরঙ্গা স্বরূপ। সৃজনী-পালিনী বৃত্তি ঐ শক্তিরই বহিরঙ্গা স্বরূপ। সৃজনী-পালিনী শক্তির মূর্ত্তি শ্রীকালিকা। হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ অদ্ভুত। কৃষ্ণের সকল ইচ্ছার আধার রাধা। "কৃষ্ণের যতেক বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।" আবার রাধার আরাধনা হইল কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ত্তি। "কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে" একের দ্বারা অপরের পূর্ণতা। দুই মিলিয়া অদ্বয় তত্ত্বের অখণ্ডতা।

শ্রীরাধার স্বাধীনতা শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-স্বরূপতা শ্রীরাধা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ধন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ধন। রাধাধনে কৃষ্ণধনী। কৃষ্ণধনে রাধাধনী। ইহাই প্রেমরসের সর্ব্বোত্তম ভূমিকা। এই ভূমিকায় শক্তিও শক্তিমান সমস্যার সমাধান। পুরুষ প্রকৃতি রহস্যের অর্গল উদ্‌ঘাটন।

শ্রীকৃষ্ণ রসস্বরূপ। শ্রীরাধা রসশক্তি। রস দুই হইয়াও বস্তুতঃ এক। তত্ত্বে এক হইয়াও আস্বাদনে দুই। এই দ্বৈতে একত্ব, একত্বে দ্বৈত, ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ সর্ব্বতোভাবে পূর্ণতম

হয়' যদি ইহা রূপায়িত হয় এমন একটি স্বরূপ বিগ্রহে, যেটি দৃশ্যতঃ একক সত্তা, অথচ তার মধ্যে আছে দ্বৈতের বিলাস।

ঐ একায়িত ঘনীভূত বিগ্রহই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরি। তিনি শক্তিও বটেন, শক্তিমানও বটেন। তিনি শক্তি-কবলিত শক্তিমান, কেবল শক্তি-বিশেষিত শক্তিমান নহেন। শক্তি-স্বায়ত্তীকৃত শক্তিমান। শক্তির মহত্তাবশতঃই শক্তিমানগ্রস্ত।

সুতরাং গৌরসুন্দরে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব পূর্ণভাবে স্বীকৃত। হ্লাদিনী শক্তি শক্তিমান হইতে নিবিড়তর ও ব্যাপকতর তত্ত্ব। রাধাদ্বারে কৃষ্ণ আবরিত। কোন অংশে বৃহত্তা না থাকিলে সম্পূর্ণ আবরিকা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

অদ্বৈতবাদের "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" বাণীর মৌলিক সত্যটিও গৌরসুন্দরে স্বরূপেতে প্রকৃত। সাধক ব্রহ্ম ভাবনা করিতে করিতে ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহা অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্তের মূলে লৌকিক সত্য হইল, যে যাঁকে ঐকান্তিক ভাবে ভাবনা করে সে তাহাই হইয়া যায়। শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপাশক্তি শ্রীরাধাকে ধ্যান করিতে করিতে রাধা রাধা ভাবিতে রাধা হইয়া গিয়াছেন। "কিশোরী স্মরি স্মরি" কিশোরী কিশোরী হয়েছেন সুতরাং অদ্বৈত উপসনার মূল তত্ত্বটিও গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রবাদের মূলতত্ত্বটিও গৃহীত হইয়াছে। আবার বেদের পুরুষবাদের চরম সিদ্ধান্তও স্বীকৃত হইতেছে। কারণ, প্রেম-পুরুষোত্তম শ্রীগৌরসুন্দর শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণই। যে স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ শক্তিকে আপনাতে পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া লইয়াছেন, সেই স্বরূপটিই গৌর। পরমা প্রকৃতি পরমপুরুষবরের প্রীতিবিধান করিতে আসিয়া অঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া সর্ব্বাঙ্গীণভাবে

নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। সেই শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণই গৌর-সুন্দর। সুতরাং সর্ব্বশক্তি-ক্রোড়ীকৃত পুরুষোত্তমই গৌর। শক্তির সত্তাকে আত্মসাৎ-কারী শক্তিধর পুরুষপ্রবরই গৌর। অতএব তন্ত্রের শক্তিবাদ ও বেদের পুরুষবাদ, এই দুয়ের চরম পরম সার্থকতা শ্রীগৌরসুন্দরে।

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পুরুষ প্রকৃতির ঊর্দ্ধে। পরমব্রহ্ম পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন। শ্রীগৌরসুন্দরও পুরুষ প্রকৃতির ঊর্দ্ধে। তবে তিনি পুরুষও বটেন, প্রকৃতিও বটেন। অদ্বৈত ব্রহ্ম সর্ব্ব ভাবগ্রাসী, শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বভাবোল্লাসী। ভাব-নির্ব্বাণে ব্রহ্ম, ভাব-রসায়নে গৌরাঙ্গ। বিলাস-বিহীন চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, রসবিলাসী পরমতত্ত্ব গৌরসুন্দর।

ব্যাকরণে একাধিক পদের একপদীকরণকে সমাস বলে। বহুব্রীহি সমাসে পদগুলি গৌণ হইয়া অন্যপদ প্রধানতা লাভ করে। দ্বন্দ্ব সমাসে উভয় পদেরই প্রাধান্য বিদ্যমান থাকে।

পরব্রহ্মে শক্তি শক্তিমানের বহুব্রীহি সমাস। শ্রীগৌর-সুন্দরে দ্বন্দ্ব সমাস। পরব্রহ্মে শক্তি শক্তিমান দুই-ই আপনাদের হারাইয়া ফেলিয়াছে। প্রাধান্য রহিয়াছে "কেবলানুভবানন্দের"।

শ্রীগৌর দ্বন্দ্ব সমাসে দুই এক হইয়াও দুয়ের প্রধানতা অক্ষুণ্ণ আছে। "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ" বাক্যে গীতা শাস্ত্র দ্বন্দ্ব-সমাসকেই সমাসের রাজা বলিয়াছেন। তবে ব্যাকরণের দ্বন্দ্ব-সমাস অপেক্ষা গৌর-দ্বন্দ্ব সমাসে কিছু বৈশিষ্ট্য অধিক আছে। ব্যাকরণের দ্বন্দ্ব সমাসে প্রত্যেক পদের প্রধানতা থাকে পৃথক

পৃথক ভাবে। শ্রীগৌরে কিন্তু তাহা হয় নাই। এখানে দুই বস্তুর প্রাধান্য রহিয়াছে, একের মধ্য দিয়া অন্যের, আলাদাভাবে নহে। কৃষ্ণময়ী বলিয়াই রাধার প্রধানতা। রাধাময় বলিয়াই কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমতা। রস হইতেই রসনা—রসনাতেই রস আস্বাদিত।

এই অভিনব দ্বন্দ্ব সমাসে সর্ব্বশাস্ত্রের দ্বন্দ্ব নিরসন হইয়াছে। শ্রীগৌরপ্রিয়জন তাই গৌরসুন্দরের দয়াকে বলিয়াছেন "সাম্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া।" সর্ব্বদ্বন্দ্বনাশী দ্বন্দ্বাতীত অপ্রাকৃত দ্বন্দ্বসমাস শ্রীগৌরাঙ্গ জয়যুক্ত হউন। জয় গৌরহরি, জয় জগদ্বন্ধু হরি।

চণ্ডীরূপা গৌরহরির স্তব

জয় জয় জগত-জননি! মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে অন্যে কে দিবেক সীমা॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব-শক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা—তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্তি-ভেদ।
সর্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগতহেতু গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি॥
সর্বাশ্রয়া তুমি সর্ব জীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমাপ্রকৃতি॥
জগতজননী তুমি দ্বিতীয় রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব জীব পাল মাতা॥
জল-রূপে তুমি সর্ব জীবের জীবন।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥
সাধুজন গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতী।

অসাধুর করে তুমি কালরূপাকৃতী ॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ-দুর্গতি ॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্বত্র উদয়া।
রাখহ জননি ! দিয়া চরণের ছায়া ॥
তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার।
তুমি না রাখিলে মাতা ! কে রাখিবে আর ॥
সবার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা ! কর নিজ দাস ॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্বভূত-বুদ্ধি।
তোমা সঙরিলে সর্ব মন্ত্রাদির শুদ্ধি ॥
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮)

গীতাধ্যান

গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব গ্রন্থ

উদ্বোধন বলেন—

"....গীতা যে কেবল সন্ন্যাস-শাস্ত্র নহে, কেবল কর্ম্ম-শাস্ত্র নহে, কেবল ভক্তি-শাস্ত্র নহে, ইহা যে জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমুচ্চয়-শাস্ত্র, অতি নিপুণতা সহকারে গ্রন্থকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শান্তিলাভের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন—জ্ঞান শান্তির জন্য অপরিহার্য্য। কিন্তু কিসের জ্ঞান? যিনি বাহিরে বিশ্বরূপ, অন্তরে যিনি ধীশক্তির প্রচোদয়িতা, তিনি সর্ব্ব-যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, তিনি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর—তিনি সর্ব্ব ভূতের সুহৃদ এই জ্ঞান। এইমাত্র উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।

দৈনিক বসুমতী বলেন—

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে সুপণ্ডিত। ধর্ম্মবক্তারূপে তাঁহার খ্যাতি আন্তর্জ্জাতিক। সর্ব্বোপরি তিনি একজন বিশিষ্ট সাধক। তাঁহার সাধনাও পাণ্ডিত্যের ধারার সম্মিলনে গীতাধ্যানের উদ্ভব। বস্তুতঃ গীতার এমন মৌলিক ব্যাখ্যা দুর্লভ।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'গীতাধ্যান' বইখানি পরম আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। হিন্দুর মহাগ্রন্থ এই গীতাকে আপনি সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে দেখিয়াছেন ও ইহার উপর সম্পূর্ণ নূতন আলোকপাত করিয়াছেন।

সুসাহিত্যিক অচিন্ত্য কুমার সেন বলেন—

আপনার 'গীতাধ্যান' একটি বিস্ময়কর গ্রন্থ। গীতার অন্তর্নিহিত অভ্রান্ত অর্থটিকে উপলব্ধির সহজ আলোতে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা	২৲
চন্দ্রপাত	৵০
উদ্ধারণ	১৲
সংকীর্ত্তন-পদাবলী	৸০
সংকীর্ত্তন-পদামৃত	১।০
চন্দ্রপাত-মাধুর্য্যবিন্দু	১৲
মহামৃত্যু-রঙ্গ	১৲
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	।৵০
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী ১ম খণ্ড ২॥০, ২য় খণ্ড ২॥০, ৩য় খণ্ড ২॥০ ৪র্থ খণ্ড ২॥০, ৫ম খণ্ড ২৸০ ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩৲, ৭ম খণ্ড যন্ত্রস্থ	
বন্ধুবার্ত্তা	৩৲
বাণীবিজয়	২৲
ব্রহ্মগায়ত্রী	॥০
উপনিষদ্ ও শ্রীকৃষ্ণ	৩৲
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ-মঙ্গল	॥৵০
স্মরণ-মঞ্জরী	।৵০
বিশ্বধর্ম্ম	।০
শ্রীশ্রীবন্ধু-স্তোত্র-রত্নাবলী	৵০
গৌরকথা ১ম খণ্ড	১৸০
২য় খণ্ড ২৲, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ	
চণ্ডী-চিন্তা	৩৲
শ্রীশ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল	১৲
শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৸০
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ-মঙ্গল	॥০
গোপীমন্ত্র-মাধুরী	॥০
বন্ধুগীতি-কুসুমাঞ্জলি	৸০
বন্ধু কে ?	।০
বন্ধুকরুণা কণিকা	॥০
মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	৵০
ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও ভারতীয়-সাধু	॥০
প্রেমের বাণী	।৵৪
ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	॥০
প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু	১।০
হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু	৸০
গীতাধ্যান ১ম খণ্ড	২৲
২য় খণ্ড ২৲, ৩য় খণ্ড	২৲
৪র্থ খণ্ড	২৲
শ্রীশ্রীকেদারবদ্রী দর্শন	।০
প্রভুর রঙ্গীন শ্রীমূর্ত্তি বড	।৴০
মাঝারী সাদা	৴০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর। **মহাউদ্ধারণ মঠ**, ৫৯, মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-১১। **শ্রীশ্রীহরিসভা**, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া। **মহেশ লাইব্রেরী**, ২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা। **ভাগবত সঙ্ঘ**, অমিয় চৌধুরী, ১৬/সি, ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯।